ভুল

জরাসন্ধ

/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৪
প্রকাশক
সুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

সুসাহিত্যিক

ও

সুখ্যাত সাংবাদিক

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

করকমলেষু

১

—মহিলাটি কে ?

—কোন্ মহিলাটি ?

—আপনার এখান থেকেই তো বেরোলেন বলে মনে হল। হাতে একটা বড় খাতা।

—ও, হ্যাঁ ; উনি হলেন এখানকার গার্লস্ স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস্।

—শুধু বাঙালী নন, তোমার আমার মতো ঢাকাইয়া বাঙাল। ইসলামপুরের নাম শুনেছ তো ? সেই বাড়ির মেয়ে।

—কুমারী ?

—কেন বল দিকিনি? ফার্স্ট সাইটেই কী যেন হয়, সে রকম কিছু ঘটল নাকি ?

—এই বয়সে!

—এমন কি আর বয়স? তাছাড়া, লেখকদের তো শুনি বয়স হয় না।

—তা মন্দ বলেন নি। বেশির ভাগ লেখকই চিরদিন নাবালক থেকে যায়।

—নাবালক নয়, যুবক। অনন্ত যৌবন। পুরুষ উর্বশী বলতে পার। তা না হলে তোমাদের অমুক, নামটা আর করলাম না, বুড়ো বয়সে এমন দুর্দান্ত প্রেমের গল্প লিখতে শুরু করেছেন, যে দুচার লাইন পড়ে আমাদেরই কান লাল হয়ে ওঠে। ছেলে-ছোকরাদের যে কী হয় সহজেই বুঝতে পারি। সে থাক। ওঁকে হঠাৎ কুমারী বলে মনে হল কেন বল দেখি? যেহেতু স্কুল-মিস্ট্রেস্, তার ওপরে পরিচয় দিয়েছি অমুক বাড়ির মেয়ে! এই জন্যে কি?

—হ্যাঁ, তাও বটে। তাছাড়া, সিঁথিটাও যেন সাদা দেখলাম।

—ও, তাও লক্ষ্য করেছ? একেই বলে লিটারারী অবসারভেশন। বাংলায় যেন কী বল তোমরা?

—ভাবতে হবে।

—আচ্ছা, সেটা তাহলে পরে শোনা যাবে। আপাতত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—না, উনি কুমারী নন।

—বিধবা?

—না, বিধবাও নন।

—খৃস্টান বুঝি?

—গোঁড়া হিন্দু।

মৃগাঙ্ক এর পরে কি বলবে ভেবে পেল না।

তার হতভম্ব ভাবটা লক্ষ করে স্মরজিৎবাবু বলেন, ব্যাপারটা একটু

কেমন কেমন মনে হচ্ছে ; তাই না ?

—শুধু কেমন কেমন নয়—

—রীতিমতো রহস্যময় —বাকী অংশটা স্মরজিৎ নিজেই পূরণ করে দিলেন।

মৃগাঙ্ক বলল, ডি. এল. রায়ের সেই গানটা মনে পড়ছে। 'মেবার পতনে' আছে বোধহয়—'সধবা অধবা বিধবা আমরা রহিব উচ্চ শির।' মেয়েদের তো এই তিনটে ক্লাসই আছে জানি। এঁকে তা হলে কোন্ দলে ফেলবেন ?

—কঠিন প্রশ্ন। তুমি সাহিত্যিক মানুষ। ভেবে-চিন্তে একটা জুৎসই নাম লাগাতে পার। যাকে বলে অভিধা—

—কিন্তু ব্যাপারটা না জানলে—

—বুঝেছি। গল্পের গন্ধ পেয়ে মনটা অমনি ছোক ছোঁক করে উঠল। কিন্তু ওঁর জীবনে যা ঘটেছিল, যার জন্যে এই তিন দলের কোনো দলেই বোধহয় ওঁকে ফেলা চলে না, সেটা মোটেই গল্প নয়। তোমার কোনো কাজে লাগবে না। পুজোর ভিড়ে চালাতে পার। কিন্তু আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা নেবে না। 'সেকেলে' 'অবাস্তব' 'অবিশ্বাস্য' এমনি গোটাকয়েক চোখা চোখা বিশেষণ লাগিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে দেবে।

—সে সবপরের কথা। আপাতত শুনি তো।···বলে গুছিয়ে বসল মৃগাঙ্ক।

—এখনই শুনবে ?

—তা মন্দ কি? ছুটির দিন। আপনার কলেজ নেই। আমারও কাজ-কর্ম বন্ধ। কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে বলেই তো বেরোলাম।

—তুমি কিছুদিন আছ তো এবার ?

—বড়-জোড় পাঁচ-সাত দিন।

—অর্ডার-পত্তর জুটল কিছু ?

—যে রকম আশা করেছিলাম ততটা হল কই ? আরো ক'দিন ঘোরাঘুরি করে দেখি।

—যা দিনকাল। একটু ভদ্রভাবে খেয়ে-পবে বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাদের পক্ষে যাদের নাম মিড্‌ল ক্লাস। বই কেনবার পয়সা কোথায় ?

—তবু, তারাই এখনো বই পড়ে এবং কিনে পড়ে। যাবা একেবারে অপারগ, তারা লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নেয়। তাদের কল্যাণেই ছোট ছোট লাইব্রেরীগুলো টিকে আছে।

—তা যা বলেছ। যাদের যত বেশী টাকা, বইয়ের পিছনে তাদের বাজেট তত কম। এ এক অদ্ভুত প্যারাডক্‌স্ এদেশে।

—বাজেট কম কি বলছেন! কোনো বাজেটই নেই। আমাকে তো ছোট বড় অনেক শহবে ঘুবতে হয়। বড়লোকেব বৈঠকখানায় কিংবা যাকে তাঁরা বলেন 'স্টাডি' সেখানে একটি করে লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরী না বলে বলা উচিত বইয়ের শো-কেস। ঝকঝকে ইংরেজি বই। সেই কতকাল আগে কিনে রেখে দিয়েছে। পড়বার জন্যে নয়, সুন্দব কবে সাজিয়ে লোককে দেখাবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে আছে তো ? 'সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা। অস্বাদিত মধু যেমন, যূথী অনাঘ্রাতা। ভৃত্য নিত্য ধুলো ঝাড়ে—'

ধুলো ঝাড়ার ধবনটাও হাতে কলমে দেখিয়ে দিল মৃগাঙ্ক। স্মরজিৎ হেসে বললেন, ওতেই আছে না ?—'পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ পরে আছেন ভাগ্যমন্ত। মেহগিনীর মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।' তুমি

এক কাজ কর। বই ক্যান্‌ভাসিংয়ের বদলে তুমি বরং ঐ রকম এক ভাগ্যমন্তের প্রাসাদে ধুলো ঝাড়ার কাজ নাও। যে রকম ডিমন-স্ট্রেশন দেখালে ওটা ঠিক পারবে।

—তা পারব। রোজগারও অনেক বেশী হবে। কিন্তু কাজটা কেউ দেবে না। আগের দিনে সাহেবরা বলত 'ভদরলোক ক্লাস' আমরা যে তাই। দেখেই বলবে ইউ আর আনফিট্ ফর ধুলো ঝাড়া।··· যাকগে। ও-সব বাজে কথা এখন থাক। শুরুতে ফিরে আসুন। ভদ্রমহিলা অনেক পিছনে পড়ে আছেন।

—না, এবার তাঁকে নিয়ে আসছি। তার আগে কিঞ্চিৎ মৌতা-তের ব্যবস্থা করা যাক। কী বল?

চাকরকে ডেকে বললেন, সিগারেট কেসটা দিয়ে যা। আর বেশ ভা-লো করে দু'কাপ চা। সেই সঙ্গে বাবুর জন্যে—বুঝলি তো? বংশীলাল ঘাড় নাড়ল। মৃগাঙ্ক বলল, শুধু 'বাবুর জন্যে' কেন?

—আমার এখন কিছুই চলবে না ভাই। বড়লোক হতে না পারলেও বড়লোকের দুটি লক্ষণ বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছি। ব্লাডপ্রেশার আর ডায়েবেটিস্। তার সঙ্গে হার্টও কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল শুরু করবার চেষ্টায় আছেন। সিগারেটের রেট আদ্ধেকে নামিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। আজ আর সেটা মানছি না। তোমার বৌদি থাকলে অবিশ্যি—

—ও, বৌদি নেই বুঝি? তাই এতক্ষণ সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। উনি কোথায় গেছেন?

—কলকাতায়। ভাইঝির বিয়ে।

—আপনার তাহলে বংশীলাল ভরসা। বৌদি ফিরছেন কবে?

—দিন পাঁচেক তো লাগবেই। তদ্দিন একটু ঢিলেঢালাভাবে চলা

যাবে। অষ্টপ্রহর গৃহিণীর খবরদারি সে কি বস্তু তা তো জানলে না ভায়া। তার চেয়ে আমার এই 'পুরাতন ভৃত্য'—

কথাটা শেষ করবার আগেই বংশীলালের প্রবেশ। চা এবং খাবা-রের ডিশ যথাস্থানে রেখে চলে গেল। স্মরজিৎ বললেন, শুরু কর। নিজেও চায়ের কাপটা টেনে নিলেন। একটু একটু করে শেষ করে সিগারেট ধরালেন। কেসটা এগিয়ে দিলেন মৃগাঙ্কের সামনে। সোফার পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলোর দিকে মিনিট কয়েক নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি স্কুল কমিটির সেক্রে-টারী, উনি হেডমিস্ট্রেস। প্রায়ই কিছু না কিছু একটা কাজ থাকে। কাজেই নন্দা ব্যানার্জিকে খাতা বা ফাইল হাতে আমার কাছে আসতে হয়। প্রথম প্রথম ওঁর সীমানা ছিল বাইরের এই বৈঠক-খানা, আর কখনো কখনো পাশের এই পড়বার ঘর অবধি। তার পর ভেতরের দিকটাতেও যেতে শুরু করলেন। ক্রমে দেখা গেল ঐ দিকটাই মুখ্য আর এখানটা গৌণ। এসেই সোজা ঢুকে পড়েন অন্দর-মহলে। ফেরার পথে কোনো দিন আমার এখানে একবার ঢুঁ মারেন। যেদিন কিছু কাজকর্ম থাকে, অনেকদিন কখন বেরিয়ে যান আমি জানতেও পারি না।

কিছুদিন যেতেই আমি 'স্যর' থেকে 'দাদা'য় প্রমোশন পেলাম। (না, 'ডিমোশন' বলবো ?) অবিশ্যি, এই বাড়িতে যখন দেখা হয় অন্যত্র বা অন্যলোকের সামনে কখনো বুঝতে দেয় না সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেস ছাড়া আমাদের অন্য কোনো সম্পর্ক আছে। আর সম্পর্কটাও এসেছে ঐ দিক থেকে। তোমাদের বেলায় এবং বোধ হয় সব ক্ষেত্রে যেমন আগে দাদা পরে বৌদি, এ বেলায় হল উলটো। বৌদির স্বামী হিসেবে আমি 'দাদা' পদ লাভ করলাম।

নন্দা আসে যায়। মেলা-মেশা, হাসি-গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা সবটাই আপনজনের মতো। কিন্তু এক জায়গায় যেন একটা শক্ত দেয়াল তুলে রেখেছে। নিজের সম্বন্ধে, অর্থাৎ এই স্কুলে চাকরি নিয়ে যখন এল তার আগেকার জীবন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নীরব। আমার কাছে না বলতে পারে, কিন্তু অসীমা, যাকে সে সত্যিই নিজের বৌদির চেয়ে বেশী মনে করে, তার কাছেও প্রায় তাই, মা-বাবা তুজনেই গত, ভাইবোনেরা ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়, দেশ ভাগ হবার পর কে কোথায় আছে ভালো করে জানবারও উপায় নেই—ব্যস ঐ পর্যন্ত। এর বেশী কিছু জানতে চাইলেও কৌশলে এড়িয়ে যায়।

অসীমা যে চেষ্টা করে নি তা নয়। এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির একটা স্বাভাবিক পটুতা আছে নিশ্চয়ই জানো। ওদের চক্ষু ও জিহ্বায় বিধাতা একটি করে জোরালো সার্চলাইট জুড়ে দিয়েছেন যার সামনে তোমার সব কিছু ধরা পড়ে যাবে, তুমি যতই কেন না লুকোতে চেষ্টা কর। কিন্তু সে জিনিসটা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও নন্দা ব্যানার্জির জীবনের সামান্য অংশই ধরতে পেরেছিল তোমার বৌদি।

নন্দার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কথা হয়েছে। আমি তু-একদিন হালকাভাবে বলেছি, কোথাও কোনো কেলেঙ্কারি-টারি করে এসেছে বোধহয়। কথার ফাঁকে পাছে কিছু বেরিয়ে পড়ে তাই মুখ খুলতে চায় না।

অসীমা প্রথম প্রথম বলত, তাই হয়তো হবে। তারপর ওদের ঘনিষ্ঠতা যখন বাড়ল একটা গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল তুজনের মধ্যে, তখন আর আমার কথায় সায় দিত না—“না গো, মেয়েটা বড় ভালো। এতদিন ধরে দেখছি তো। কোনো রকম কেলেঙ্কারি ও করতে

পারে বলে আমি মনে করতেই পারি না। আমার বিশ্বাস কোনো জায়গায় হয়তো একটা বড় রকমের ঘা খেয়েছে, কিংবা এমন কিছু ঘটেছে ওর জীবনে যা কাউকে বলা যায় না। আমিও আর সে সব নিয়ে কোনো কথা-টথা পাড়ি না। কী দরকার? বলতে যখন চায় না, থাক।

পাড়তে হল না। নিজে থেকেই একদিন তার সব কথা উজাড় করে দিল নন্দা। এক রকম হঠাৎই বলা যেতে পারে। উপলক্ষ একটা ছিল। কিন্তু সে অতি সামান্য।

"স্মরজিৎবাবু আছেন নাকি?" বলতে বলতে একটি ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। "আসুন, আসুন," বলে স্মরজিৎ তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। আর মৃগাঙ্কের চোখে এমন দৃষ্টি ফুটে উঠল যে সত্যযুগ হলে আগন্তুক ঐখানেই ভস্ম হয়ে যেতেন। বোঝা গেল গৃহকর্তার কোনো বিশিষ্ট বন্ধু। কিন্তু তাই বলে ঠিক ঐ মোক্ষম সময়টিতে এসে পড়তে হবে?

স্মরজিৎ পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডক্টর মহাপাত্র, এখানকার মেডি-ক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আর এ আমার বিশেষ বন্ধু, যদিও বয়সে অনেক ছোট, মৃগাঙ্ক মৌলিক, কলকাতার একটি বিলিতি পাবলিশিং ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ।

—জানি, সামনের কৌচটায় বসতে বসতে বললেন ডক্টর মহাপাত্র, আমার ওখানেই আলাপ হয়েছে। কাল যদি আমার অফিসে এক-বার আসেন, লিস্টটা পেয়ে যেতে পারেন।

"যাবো।" সংক্ষেপে এবং গম্ভীরভাবে কোনোরকমে উত্তরটা সেরে দিল মৃগাঙ্ক। তখনো তার ভিতরটা রাগে গরগর করছে।

মহাপাত্র স্মরজিৎবাবুর দিকে ফিরে বললেন, কলেজের জন্যে কিছু

মেডিক্যাল বুক্‌স্ কিনতে হবে। সাধারণত আমাদের লোক গিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে আসে। এবার যখন ওঁকে হাতের কাছে পাওয়া গেল, ভাবলাম অর্ডারটা ওঁদের ফার্মকেই দিই। একটি শিক্ষিত ছেলে অনেস্টলি খাটছে। ছুটো পয়সা যদি পাইয়ে দেওয়া যায়—। আপনার কলেজেও তো বই-টই কেনা হয়।

—সে অতি সামান্য।

—যাই হোক। তবু কিছু তো বটেই। উনি শুনলাম বাংলা বইও দিতে পারেন। অনেক বাঙালী আছেন এখানে। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন না।

—সে চেষ্টা করছি। মৃগাঙ্ক নিজেও একজন লেখক।

—তাই নাকি? কই, সেকথা তো বলেন নি।

"ওটা বলবার মতো কিছু নয়।" এবার ভালভাবেই বলল মৃগাঙ্ক। গল্পটা মাটি করলেও লোকটিকে নেহাত খারাপ বলে মনে হল না।

মহাপাত্র প্রতিবাদ জানালেন, বলবার মতো নয় বলছেন কেন? রাইটারের একটা আলাদা স্থান আছে, পোজিশন আছে সমাজে।

—থাকতে পারে। কিছু মনে করবেন না, সেটা শুধু নামে। আসলে তারা কৃপার পাত্র। বিশেষ করে উঁচু মহলে।

—না, না, ওটা আপনি ঠিক বলছেন না। আমরা মনে করি তাঁরা সম্মানের পাত্র। সে সম্মান দিয়েও থাকি। আমার কলেজে যে-সব ফাংশন হয়, নিউ ইয়ার্স ডে, ফ্রেসার্স ওয়েলকাম— আরো অনেক কিছু, আমি ছেলে-মেয়েদের বলে রেখেছি, সব ব্যাপারেই একজন লেখককে চীফগেস্ট করে আনতে হবে। এই নিয়মই চলে আসছে।

মৃগাঙ্ক দেখল ভদ্রলোক সত্যিই অতি ভালমানুষ। অতবড় পদে থেকেও নিতান্ত সরল। তা না হলে সিরিয়াসলি মনে করেন, সোশ্যাল

ফাংশানে প্রধান অতিথি হওয়াটাই মস্ত বড় সম্মান ? সে যে কি নিদারুণ বিড়ম্বনা উনি জানেন না। জানাতে যাওয়াও নিবর্থক। যে সমাজ, যে কাল মানুষেব দাম কষে একমাত্র টাকাব অঙ্কে, ধনকেই মনে কবে মানেব মাপকাঠি—সেখানে উনি একজন লেখককে উঁচু স্থান দিয়ে বসে আছেন !

মৃগাঙ্ক বড লেখক নয। সভা-সমিতি, গানবাজনাব আসব বা নাট-কাদির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিব আসনে তাব ডাক পডে না। তাকে স্নেহ কবেন এমনি একজন প্রাচীন ও প্রখ্যাত লেখক, যিনি প্রায়ই ঐ আসন অলঙ্কৃত কবে থাকেন অর্থাৎ জনপ্রিযতা বক্ষাব জন্যে কবতে বাধ্য হন, একবাব তাব নিজেব অভিজ্ঞতাব বর্ণনা দিয়ে-ছিলেন—একদিন এক ফাংশানে চীফ গেস্ট হযে গেছি। কুস্তিব আখড়া; বাববেল-প্যাবালাল বাব এসব ও বযেছে দেখলাম। অর্থাৎ ব্যায়াম-ট্যাযাম ও কবে বোধহয। একপাশে চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ চাবদিকে একটা সাডা পড়ে গেল। একদল ছোকবা ছুটে গেল গেটেব দিকে। সভাপতিব গাড়ি এসে গেছে। কে তিনি ? গোটা তিনেক ব্যাশন-দোকানেব মালিক। সেটা হল বাইবেব পরি-চয। অন্তবালে ব্যাপাবটা আবো বৃহৎ। ঐ ছেলেগুলো জানে সব এবং নামেব আগে সবসময়েই তালব্য শ'-এ আকাব লাগিয়ে থাকে। কিন্তু মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন। কী সম্মান তাঁর। ঘিরে ধবে টংয়েব উপব নিযে তুলল। ঘন ঘন ক্যামেবায় ফ্ল্যাশ। আমি নিচেই বসে আছি এক কোণে। হঠাৎ বোধহয় কাবো মনে পড়ে গেল।

—আসুন স্যব।

অতি কষ্টে উঠলাম। ফুলেব মালাও জুটল একটা। তবে সভা-

পতিরটা তাঁরই মতো গায়ে ভারী, আর আমার কণ্ঠে যেটি পড়ল, নিতান্তই ক্ষীণ। তারপর বক্তৃতা। আমি ছুকথায় সেরে দিলাম। ওঁর লিখিত ভাষণ আরেকজন পাঠ করে শোনাল। কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?

মৃগাঙ্ক বলেছিল, তারপর ?

তারপর বিদায়-পব। উনি তো ওঁর জমকালো গাড়িতে চলে গেলেন। আমার ট্যাক্সি আর আসে না। আনবে কে ? তখন বড় বড় গাই-য়েরা আসতে শুরু করেছেন। সবাই তাদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি শ্রোতার আসনে নেমে এসেছি। একজনের পর আরেকজনের গান শুনছি, অর্থাৎ তাছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। তখন কি মনে হচ্ছিল জানো ? কালোবাজারীর মসনদ না হয় না পেলাম। সে ভাগ্য আর ক'জনের হয় ? কিন্তু চেষ্টা করলে ঐ রকম ছু-একটা 'আধুনিক' কিংবা তথাকথিত 'রবীন্দ্র-সংগীত' ও কি শিখতে পারতাম না ? খাতিরও হত, সেই সঙ্গে এক-খানা পুরুষ্টু খামও পকেটে আসত। একটা রজনীগন্ধার টিনটিনে মালা হাতে করে ট্যাকসির অপেক্ষায় বসে থাকতে হত না।

ডক্টর মহাপাত্র যখন উঠলেন, মৃগাঙ্কর ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবু আশা করছে স্মরজিৎ আবার বসবেন। ঐ রকম একটা জায়গায় এনে তাকে ছেড়ে দেবেন না। হয়তো বসতেন। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর একান্ত বশংবদ 'পুরা-তন ভৃত্য'। একগাল হেসে দাঁড়াল মনিবের ঠিক পাশটায়।

"কি রে ?" জানতে চাইলেন স্মরজিৎ, যদিও তার কোনো প্রয়োজন

ছিল না। বংশীলাল যথারীতি নিরুত্তর। মৃগাঙ্ক ব্যাপারটা আগেই বুঝতে পেরেছিল। তবু বলল, ওটা বুঝি উঠবার নোটিস?

—শুধু নোটিস নয়, আলটিমেটাম। অমান্য করলে যথাস্থানে রিপোর্ট পেশ করা হবে। তুমি এক কাজ কর। চট করে চানটা সেরে নাও। আমার সে পর্ব সকালেই চুকে গেছে। তারপর চল একসঙ্গে বসে পড়া যাক।

—আজ থাক।

—কেন, থাকবে কেন? বংশীলাল কদ্দূর কী করল একবার পরখ করে দেখতে দোষ কী? আমার তো মনে হয় তোমার হোটেলের মহারাজ যা 'পাকান' তার চেয়ে বিশেষ খারাপ হবে না।

—না; বলে আসি নি। মহারাজ বসে থাকবেন। তাঁকে চটানো ঠিক হবে না। আরো কিছুদিন তাঁর 'মেহেরবানি'র ওপর নির্ভর করতে হবে তো।

—তাহলে ওবেলা একটু সকাল সকাল চলে এসো। মহারাজকে জানিয়ে এসো, যেন বসে না থাকেন।

সাড়ে চারটা নাগাত চায়ের ঠিক আগেটায় এসে পড়ল মৃগাঙ্ক। গল্প বলা ও শোনার অনুপান হিসাবে ঐ তরল পদার্থটি অপরিহার্য। বংশীলাল তৈরি ছিল। আসর শুরু হতে দেরি হল না।

-কোথায় যেন থেমেছিলাম? জিজ্ঞাসা করলেন স্মরজিৎ।

তাঁর ভাষাসুদ্ধ উদ্ধৃতি করে মৃগাঙ্ক বলল, নন্দা ব্যানার্জি একদিন নিজে থেকেই তাঁর সব কথা উজাড় করে দিলেন।

—ও, হ্যাঁ। কিন্তু মুশকিল কি জানো? উজাড়ই বল আর যাই বল, সেটা সে আমার কাছে করে নি। করেছিল অসীমার কাছে। আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। একে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড তার উপরে

যাকে রস বলে সে সব বালাই আমার নেই। থাকবার কথাও নয়। কুড়ি বছর মফস্বল শহরের কলেজে অঙ্ক পড়াচ্ছি। সুতরাং—

—আচ্ছা, আপনি এবার শুরু করুন তো।

—বেশ, তবে শোনো। নন্দার সংসার বলতে প্রথমে ছিল সে আর একটি দেহাতী ঝি। এ দেশে বলে দাই। রান্নাবান্না থেকে ঝাড়া-পোঁছা সব করে। বয়স হয়েছে। খানিকটা গার্জিয়ানও বলতে পার। নন্দার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও অতটা দেখায় না। আঁট-সাঁট গড়ন। তার ওপরে চেহারা ভালো। তুমি তো দেখেছ।

মৃগাঙ্ক ছদ্ম আপসোসের সুরে বলল, ভালো করে আর দেখতে পেলাম কই? একবার তাকিয়েই হন হন করে চলে গেলেন। চল্লিশ কী বলছেন! আমার তো মনে হল তিরিশের মধ্যে।

—তোমার মতো সেটা অনেকেরই মনে হতে পারে। তাই শুরু থেকেই আমাকে সাবধান হতে হয়েছে। স্কুলের বুড়ো দারোয়ানের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি ওর আউটহাউসে। গার্লস্ স্কুলের সেক্রেটারী হওয়ার ঝামেলা কি কম?

—সুবিধেই বা কম কী? মুচকি হেসে মন্তব্য করল মৃগাঙ্ক।

—'সুবিধে'র বয়স কি আর আছে ভাই? তোমার মতো ঝাড়া হাত-পা হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এদিকে যে সাত পাকের বাঁধন। যাক, যা বলছিলাম। নন্দার আর একটি পুষ্যি বাড়ল। ক্লাস এইট না নাইনের একটি মেয়ে। তাকে এনে রাখল বাড়িতে। কিছু হয়-টয় না। তবু কি করে এল মেয়েটি তার একটা ইতিহাস আছে। সে সব পরে আসবে।

অসীমা তো প্রায়ই যায় ওর বাসায়। একদিন সন্ধ্যার মুখে গিয়ে দেখে বাইরের ঘরে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। আলো

জ্বালা হয় নি। সুইচটা টিপে দিতেই চমকে উঠল—এসো বৌদি। নিস্তেজ শুকনো গলা। অন্য সময় 'বৌদিকে' দেখা মাত্র ছেলে-মানুষের মতো হৈচৈ বাধিয়ে দেয়।

—কী হয়েছে? অন্ধকারে চুপ করে বসে আছ যে? জিজ্ঞাসা করল অসীমা।

মুখে একটা ম্লান হাসি টেনে এনে উত্তর দিল নন্দা, সুমি-টা চলে গেল।

—কোথায়?

—বাড়ি। ওর বাবা এসে নিয়ে গেলেন।

অনেক দিন ছিল মেয়েটি। একেবারে ওর নিজের মেয়ের মতো মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। অসীমা বলল, কী করবে বল? পরের মেয়ে। চিরকাল তো আর ধরে রাখা যায় না। নিজের মেয়েই বা ক'দিন থাকে। এই ছাখ না আমার রাখী। দু হপ্তা না যেতেই—

নন্দার কানে বোধহয় ঐসব সান্ত্বনার কথা ঢুকল না। কী ভাব-ছিল সে-ই জানে। একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, যাক; ভালোই হল। অ্যাদ্দিন ধরে একটা ভুলের বোঝা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। সেটা নেমে গেল। আমিও বাঁচলাম।

—ভুলের বোঝা মানে? অসীমা একটু কৌতূহলী হল।

নন্দা তখনো তার নিজের কথার সূত্র ধরেই বলে চলেছে--কী যে দারুণ অস্বস্তি, জানো বৌদি? সব সময়ে মনে হত এ আমার কী হল। এতকাল পরে এ কোন্ পাগলামিতে পেয়ে বসল আমাকে। কিসের মোহ! সব কিছুই তো সেই ক-বে চুকিয়ে এসেছি। বুড়ো বয়সে তার জের টানা! এ কী দুর্মতি ঘাড়ে চাপল!

একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, অথচ, তোমার কাছে লুকোবো

না বৌদি, এর মধ্যে কেমন একটা, কী বলব, সুখের স্বাদ ছিল। একটা তৃপ্তি। নিজের মনে বলতাম জীবনে কিছুই তো পাই নি, হাতে পেয়েও নিই নি। একটু যদি আপনা থেকে এসে থাকে, বুঝতে হবে সেটা আমার ভাগ্যের দান। ভগবান দিয়েছেন…। যাক, আজ আর ওসব কথা ওঠে না। যা ভেবেছিলাম, দেখা গেল সবটাই মিথ্যা। মনের মধ্যে উঠতে বসতে যে অস্থিরতা চলছিল তার থেকে রক্ষা পেলাম। নিশ্চিন্ত হলাম।·· তোমার জন্যে একটু চা করতে বলি বৌদি?

উঠতে যাচ্ছিল। অসীমা বলল, না, চা আমি এখ্‌খনি খেয়ে এসেছি। তুমি বসো।···

বলে নিজেই গিয়ে বসল ওর পাশটিতে। পিঠের উপর হাত রেখে বলল, কী হয়েছে বলবে আমাকে?

নন্দা মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল, কোনো উত্তর দিল না। অসীমা আজ আর একটু এগিয়ে গেল—নন্দা, তোমাকে তো আমি আজ থেকে দেখছি না। আমি জানি তোমার মনের মধ্যে একটা কোনো গভীর ব্যথা আছে। তুমি লুকিয়ে রাখলেও তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। অনেক সময় জানতে ইচ্ছা হয়েছে। তারপর ভেবেছি, আমি তো ওর দিদির মতো, তবু যখন বলছে না—

বাকীটা না শুনেই নন্দা তোমার বৌদির একটা হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে বলল, দিদির মতো কেন বৌদি, তোমাকে আমি আমার নিজের দিদি বলেই জানি। আজ আর তোমার কাছে কিছু লুকোবো না। এভাবে আর সত্যিই পারছি না। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। বলবো; আমার সব কথা তোমাকে খুলে বলবো। স-ব।

এখানে একবার থামলেন স্মরজিৎবাবু। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বোধহয় মনে মনে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন নন্দার সেই দীর্ঘ কাহিনীর উপর, নিজের কানে নয়, স্ত্রীর মুখ থেকে যা শুনেছিলেন। তারপর বললেন, তোমার বৌদি থাকলে বড় ভালো হত। তার কাছ থেকে যা পেতে আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে কি? এ তো শুধু গল্প বলা নয়, কতগুলো ঘটনা পর পর সাজিয়ে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে আর একটি জিনিস আছে যার নাম অনুভব, ট্রু ফীল্। সেইটাই আসল। আমি ভাবছিলাম—

মৃগাঙ্ক বাধা দিল, আপনার ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নেই দাদা। এতক্ষণ যা শুনলাম এবং বুঝলাম, বৌদি নেই বলে সেই আসল বস্তুটির কোনো অভাব হবে না।

স্মরজিৎবাবু একটু হাসলেন। তারপর ফিরে গেলেন, কিছুক্ষণ আগে যেখানে এসে থেমেছিলেন তাব আগের অধ্যায়ে নন্দার প্রথম জীবনে, যেখান থেকে তার কাহিনীর সূত্রপাত। প্রথমে ভেবেছিলেন তাঁর কাজ হবে যৎশ্রুতং তদ বর্ণিতং—যা শুনেছেন, তাই শুধু বলে যাবেন। কিন্তু ঘটনার ধারা ক্রমশ যেমন বিস্তৃত হল, নন্দা যা বলেছিল শুধু তার মধ্যেই সেটি আবদ্ধ থাকতে চাইল না। সে যা বলে নি, বলতে পারে নি, অথচ যা তার সাক্ষাতে কিংবা অগোচরে ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায় তেমন কিছু তথ্যও যুক্ত করলেন স্মরজিৎ। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে রইল তাঁর নিজস্ব ভাষ্য।

২

নন্দার বাবা রায়সাহেব রঘুনাথ ব্যানার্জি ঢাকা বার-এবড় অ্যাড-ভোকেট। তাঁর বাবাও ছিলেন তাই। বাবার জীবদ্দশাতেই রঘুনাথ মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছেন। পরে স্বাভাবিকভাবেই সেরেস্তা আরো বেড়েছে; দুই পুরুষের ওকালতি ব্যবসায়ে প্রায় ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে। পিতার প্রতিষ্ঠা তো থেকেই যায়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় পুত্রের পসার।

ইসলামপুরে বিরাট বাড়ি। পুরনো ধরনের। তার মধ্যে অর্থাৎ এখানে ভেঙে ওখানে গড়ে খানিকটা তাঁর কালের ধারা আনবার চেষ্টা করেছেন রায়সাহেব। ঠাকুর-দালান নাটমন্দির এসব অবশ্য আছে। বারোমাসের তেরোপার্বণও চলছে। আচারে আচরণে ধর্মীয় সংস্কারে

২

বাঁড়ুজ্যেরা ররাবরই প্রাচীনপন্থী। একটু গোঁড়া হিন্দু বলে খ্যাতি অখ্যাতি দুটোই ছিল এবং খানিকটা রয়ে গেছে।

রঘুনাথের বাবা ছিলেন নরম স্বভাবের সাদাসিদে মানুষ। নীচু থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠেছিলেন। রঘুনাথ তাঁর অবস্থার মধ্যে মানুষ। তাই বোধহয় স্বভাবটাও সেইমতো তৈরি হয়েছিল। দাম্ভিক বলা ঠিক হবে না, যদিও আড়ালে তাই বলত লোকে। বেশ কড়া রাশভারীএবং একরোখা। 'আমি যা ভালো বুঝবো তাই হবে, তার উপরে আর কোনো কথা নেই'—কথায় বার্তায় কাজে কর্মে এই ভাবটাই প্রকট। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাতেই অভ্যস্ত। পছন্দ হোক না হোক মেনে নিতে হবে। 'ওঁকে ঘাঁটাতে যেও না' —এটাই এ সংসারের সাধারণ নিয়ম।

সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। এখানেও ছিল। এক জায়গায়। মা। মাকে বলা যায় বাপের ঠিক উলটো। বাড়ুজ্যে বাড়ির এক-কালের ডাকসাঁইটে গিন্নী। রঘুনাথ যখন ছোট ছিলেন, ছোট কেন, বেশ বড় হবার পরেও, মাকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন। এখনও সমীহ করে চলেন। মা-র কথার উপর বড় একটা কথা বলেন না। ইদানীং অবশ্য কোনো ব্যাপারেই থাকেন না তিনি। বয়স আশি হতে চলল। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রঘুনাথ তার শত কাজের মধ্যেও রোজ একবার অন্তত মা-র কাছে গিয়ে বসেন, কথা বলেন, খোঁজখবর নেন।

দু ভাই তিন বোনের মধ্যে নন্দা সকলের ছোট। জন্মের পরেই কী একটা বড় রকমের অসুখ করেছিল। তার জের কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রোগা গড়ন। বয়স অনুপাতে বাড় নেই, অনেকটা ছোট দেখায়। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল, যাকে বলে ডেলিকেট। ঠাকুরমা

সকলকে বলেন, আমার নাতি-নাতনীগুলো, বলতে নেই, সবাই বেশ মানুষের মতো। এই একটা তালপাতার সেপাই যে কোত্থেকে এসে জুটল!

নন্দা হাসে, আজ না হয় তালপাতা আছি, আর কিছুদিন পরে সত্যি সত্যি সেপাই হয়ে লড়াই করতে যাবো, দেখে নিও।

ঠাকুরমার বোধহয় নিজের বিগত দিনের কথা মনে পড়ে। বলেন, তা যা বলেছিস। মেয়েমানুষের সারা জীবনটাই একটানা লড়াই।

নন্দার গড়ন আর স্বাস্থ্য যাই হোক, রূপ আছে। যেমন রং তেমনি মুখশ্রী। তার উপরে তীক্ষ্ণ মেধা। ক্লাসে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ওঠে। পড়াশুনোয় ভীষণ ঝোঁক। এরকমটি আর কেউ ছিল না। হয়তো প্রৌঢ় বয়সের সন্তান বলেই এতটা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে। রঘুনাথের ইচ্ছা নন্দাকে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত পড়াবেন। এ বাড়ির চিরাচরিত রীতি, তেরো পার হবার আগেই মেয়েকে পরের ঘরে পার করা, এর বেলায় তা করবেন না। দুটি ছেলেই বুদ্ধি-বিদ্যার দিক দিয়ে সাধারণ স্তরের উপরে নয়। পাস টাস করে বেরিয়ে গেছে। ছোটটি চাকরি করে, মাঝারি গোছের সরকারি চাকরি। বড়টিকে নিজের জুনিয়র করে নিয়েছেন। কিন্তু তেমন 'ব্রাইট' নয়। খুব একটা 'সাইন' করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁর একটা মস্ত বড় আপসোস—নন্দা কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল! স্ত্রীকে একদিন বলেও ফেলেছিলেন, জানো, এ যদি ছেলে হত একে আমি বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনতাম।

এই রকম একটা হাস্যকর উক্তি শুনেও নন্দার মা সামনে কিছু বলেন নি। জানতেন, রঘুনাথ ওটা মোটেই হালকাভাবে বলেন নি। তাঁর একটা গভীর মনোগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন তিনি

স্ত্রীর কাছে। আড়ালে অবশ্য এটা খানিক পারিবারিক হাসির খোরাক যুগিয়েছিল।

নন্দার দিদিরা ওর চাইতে বেশ কিছুটা বড়। যথাসময়ে, অর্থাৎ তেরো পেরোতে না পেরোতেই তারা শ্বশুরঘর করতে চলে গেছে। নন্দা চৌদ্দয় পড়ল। কিন্তু 'কত্তা'র সেদিকে হুঁশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেয়ের মা দু-একবার পেড়েছিলেন কথাটা, কিন্তু রঘুনাথ বিশেষ গা করেন নি। তখন কত্তামা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। বয়স যতই হোক এখনো হিসাবে ভুল হয় না। কর গুণে গুণে ঠিক বয়সটা বের করে ফেললেন এবং তারপরেই ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। বেশ রাগতভাবে বললেন, শুধু কাছারি নিয়ে থাকলেই তো চলে না রঘু। মেয়ে যে এদিকে তালগাছ হয়ে উঠল, সে খেয়াল আছে?

কথাটা একেবার মিথ্যা নয়। রোগা হলেও নন্দা হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। রঘুনাথ বললেন, আরো কিছুদিন যাক মা। ওর যা শরীর স্বাস্থ্য, শ্বশুরবাড়ির ধকল সইতে পারবে না।

—খুব পারবে। এখন ঐ রকম রোগা আছে, বিয়েব জল গায়ে পড়লেই দিব্যি সেরে উঠবে দেখিস। সুধাও তো প্রায় ওরই মতন ছিল। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই, বলতে নেই, কেমন মোটাসোটা হয়ে ফিরে এল।

সুধা নন্দার ঠিক উপরের বোন। গড়নটা একটু পাতলার উপরে হলেও স্বাস্থ্য অনেক ভালো। চৌদ্দ বছরের পড়বার আগেই বেশ বড়সড় দেখাত। 'কত্তামার' হয়তো মনে নেই, কিংবা ইচ্ছা করেই সেটা চেপে গেলেন। রঘুনাথও আর সে কথা তুললেন না। বললেন, দেখি।

তখনকার মতো 'দেখি' বলে চলে এলেও বেশী দিন স্থির থাকতে পারলেন না। আবার একদিন জরুরী তাগিদ দিলেন মা। এবার একেবারে মোক্ষম অস্ত্র—"তোর জন্যে কি চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে ?" কন্যা ঋতুমতী হবার আগেই যদি তাকে পাত্রস্থ করা না হয় তাহলে ঐ মহাসর্বনাশ অনিবার্য—রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে এ সংস্কার তখনো বদ্ধমূল। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির আটাত্তর বছরের বৃদ্ধার মনেও সেটা স্বভাবতই গাঁথা হয়ে গেছে। সেখানে কোনো যুক্তি চলবে না। একথা বলা বৃথা হবে যে ওসব আর কেউ মানে না, সব বাড়িতে বড় বড় মেয়ে আছে, সকলেই যদি চৌদ্দপুরুষ নরকে যেতে শুরু করে থাকে, এতদিনে সেটা ভর্তি হয়ে গেছে।

রঘুনাথ ভেবে দেখলেন মা-র এটা শেষ ইচ্ছা, তাঁর পক্ষে একান্ত সঙ্গত ইচ্ছা এবং তাঁর পিছনে অতবড় দৃঢ় সংস্কার রয়ে গেছে! এ যদি পূরণ না হয়, তাঁর যা বয়স ও শরীরের যা অবস্থা, কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। তিনিই প্রকারান্তরে মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবেন! এই চিন্তাই তাঁকে বিশেষভাবে চঞ্চল করে তুলল। মা তাঁর জীবনে অনেকখানি।

নন্দার সম্পর্কে মনে মনে যে সংকল্প করে রেখেছিলেন, টিকল না। সেই গতানুগতিক পথই ধরতে হল। বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে ঘটকের আনা-গোনা শুরু হল।

ওদিকে আরেক সমস্যা। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির মেয়েরা পুতুল খেলতে খেলতে বিয়ের স্বপ্ন দেখে। তাদের খেলাই হল বৌ বৌ খেলা। দশ বছর বয়স থেকেই ভাবতে শুরু করে কবে বিয়ের ফুল ফুটবে। সেই বিশেষ রাতটির জন্যে মনে মনে তৈরি হয়। অনেক আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে। দূর-দূরান্তর থেকে কত আত্মীয়-স্বজনেরা

আসতে শুরু করবে। বাড়িতে পা ফেলাব জায়গা থাকবে না, হাসি ঠাট্টা হৈচৈ চলতে থাকবে সারাদিন, যাত্রার দল আসবে, ভিয়ান বসবে। তাবই ভিতব দিয়ে একটি লাজুক লাজুক নতুন সঙ্গীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে চলে যাবে পবেব ঘবে, আসলে যেটা তাব নিজেব ঘব। আবহমান কাল থেকে এই-টাই তাবা জানে ও দেখে এসেছে।

সেই পরিবেশ ও মানসতার মধ্যে মানুষ হয়েও বাড়িব কনিষ্ঠ কন্যাটি বলে বসল, আমি বিয়ে বসবো না। (ওদের অঞ্চলে ছেলেবা বিয়ে কবে আব মেয়েরা বিয়ে বসে।)

মা-ব কাছেই বলেছিল প্রথম। ক্রমে সকলেব কানে গিয়ে পৌঁছল। দাদারা বিবক্ত হল—এবই মধ্যে বড্ড জ্যাঠা হয়ে উঠেছে মেয়েটা। বৌদিদেব মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল। তুই দিদি থাকে কাছা-কাছি। তাবা শুনে বকুনি দিল, লজ্জা-সবমেব মাথা খেয়ে বসে আছিস, না, কী?

মা কিন্তু একটু ভয় পেলেন। মেয়েকে তিনি চেনেন। ওব বাপেব ধাবা পেয়েছে, যা বলবে তাব নডচড হওয়া শক্ত। ঠাকুবমাব ফোকলা দাঁতে হাসি ধরে না—"বলেছে নাকি? ও-বকম সবাই বলে। তাব মানে মুখে খিদে চোখে লাজ।" বাবা শুনে গম্ভীব হয়ে গেলেন, কিছুই বললেন না।

এদিকে একটা পাত্রপক্ষের সঙ্গে কিছু দিন থেকে কথাবার্তা চল-ছিল। তাবা দেখতে আসবে। দেখাব তারিখও স্থিব হয়ে গেছে। বিকেল চারটে নাগাত সময় দিয়েছে, এ পক্ষও তাতে বাজী হয়েছে। নন্দা সকালবেলা দবজা বন্ধ কবে পড়ছিল। কপাটে টোকা পড়ল। সাড়া দিল, "কে?"

—খোল ; আমি।

বড়বৌদির গলা। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে বলল, শোন, আজ আর ইস্কুলে যেতে হবে না।

—কেন ?

—ওরা যে চারটের আগেই এসে পড়বেন।

—কারা ?

—যারা তোমাকে আজ দেখতে আসছেন। আসল মানুষটি অবিশ্যি থাকছে না। গুরুজনদের সামনে তো আসতে পারে না। সেটা হবে গোপনে। ভেবোনা। মেজো ঠাকুরঝির কী রকম দেওর হয়। ও-ই সব ব্যবস্থা করবে।

বলে মুখ টিপে হাসল বড়বৌ।

নন্দা গম্ভীরভাবে বলল, আমি তো আগেই বলে দিয়েছি তোমা-দের এই সব বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে আমি নেই।

—বিয়েটা আমাদের নয় ভাই: তোমার। কাজেই তুমি না থাকলে চলবে কেন ?

—যারা আসছে তাদের মানা করে দিতে বল। আমি কারো সামনে সঙ সেজে গিয়ে বসতে পারবো না।

—ছিঃ, ওরকম পাগলামো করে না। বাবা সব নিজে ওদের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন ! একেবারে বাইরের লোক নয়, কুটুম্ব ! এখন কি ওসব বলা চলে ! আর পড়তে হবে না। ওঠো, সকাল সকাল চান টান করে নাও। এই একবোঝা চুল। শুকোতেই তো বেলা কাবার হয়ে যাবে। তারপর বাঁধতে বসা। ছাখ না, কী রকম সাজাই আজ তোমাকে !

মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে ছোট ননদটিকে সস্নেহে আদর করল

বড় বৌ। এ বাড়িতে যখন প্রথম বৌ হয়ে আসে, নন্দা তখন খুব ছোট। শাশুড়ীব শরীর প্রায়ই ভালো যেত না। বেশির ভাগ ঝক্কি তাকেই পোহাতে হত। নন্দাও সেই শিশু বয়স থেকে মা-র চেয়ে বড়বৌদিকে বেশী চেনে! আজ সেই বৌদিই তাকে অমন কবে বলতে এসেছে। তবু সে নড়ল না, মাথা তুলল না। শক্ত কাঠ হয়ে বসে রইল।

বৌদি আবাব বোঝাতে লাগল, তুমি তো সবাব ছোট। তোমাব বিয়ে! আমাদের বাড়ির শেষ কাজ। ঠাকুমা বেঁচে রয়েছেন। আব ক'দিনই বা বাঁচবেন? তিনি দেখবেন। কত বড় ভাগ্যেব কথা বল তো? তাছাড়া, বাবা-মা তোমাব দাদারা দিদিবা আমবা—সকলেব ইচ্ছা·

—আর আমার ইচ্ছা বলে কিছু নেই?

—কী তোমাব ইচ্ছা বল?

—কতবার বলবো? আমি বিয়ে বসবো না; ব্যাস।

—সাবা জীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবে?

—হ্যাঁ; তাই থাকবো।

বড়বৌ নন্দার ঘব থেকে চলে গেল। শাশুড়ীকে গিয়ে সে বলল, আমার দ্বারা হবে না মা।

—কী বলে হতভাগী?

— সেই এক কথা। একেবাবে ধনুর্ভঙ্গ পণ কবে বসে আছে। আপনি একবার বলে দেখুন।

—আমি! আমাকে তো তিন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। আমাব একটা কথা ও কোনোদিন শুনেছে, দেখেছ?

আর একটু কাছে সবে আসতে ইশাবা করলেন বড়বৌকে। এদিক

ওদিকে চেয়ে চাপা গলায় বললেন, সব গণ্ডগোলের মূলে হচ্ছে ঐ পোড়া ইস্কুল। লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হচ্ছে মেয়ে! বছর বছর গোছা গোছা বই, দুটো তিনটে মেডেল নিয়ে আসছে কী নাকি সব বড় বড় সায়েবদের হাত থেকে! বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে! এবার বোঝ, কোথায় থাকে তোমার বংশের মুখ! মরুকগে। আমার কি? আমার কথা কে শোনে? দাসী-বাঁদির মতো এক কোণে পড়ে আছি।

বড়বৌয়ের বুঝতে বাকী রইল না শাশুড়ীর এই ক্ষোভের লক্ষ্য একটি বিশেষ ব্যক্তি। চাপাই থাকে। এই মুহূর্তে একটা উপলক্ষ পেয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার দৌড় বেশী নয়। পরের উক্তিতেই সেটা বোঝা গেল—আসুন উনি। মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন ভালো। না হয়, যা ভালো বোঝেন করবেন।

বড়ছেলে কাছারি থেকে সকাল সকাল ফিরে এল। রঘুনাথ আগেই সেইরকম নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। ডিস্ট্রিক্ট জজের ঘরে তাঁর একটা জরুরী কেস্ আছে। বেরোতে দেরি হতে পারে। ছেলে যেন আগে আগে এসে এদিকের সব ব্যবস্থা করে। মা এবং স্ত্রীকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝল, একটা কিছু ঘটেছে। বলল, কী হল? তোমরা এখানে কী করছ? ওদিকের আয়োজন সব ঠিক আছে তো?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল, দুটো বেজে গেছে। কনে সাজাতে বসবে কখন?

বৌ কোনো উত্তর দিল না। মা বললেন, সাজতে না চাইলে জোর করে তো আর কাউকে সাজানো যায় না।

—মানে?

—তোমার বোন জেদ ধরেছেন যারা দেখতে আসছে তাদের সামনে বেরোবেন না।

—সে কী! অনেকটা নিজের মনে বলল উমানাথ! তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে, না একটা কিছু করবে?

—কী করবো?

—বাঃ, ওকে বোঝাতে হবে না যে এটা ছেলেখেলা নয়? একদল লোককে কনে দেখতে ডাকা হল, কনে বলল, আমি যাবো না, এ কখনো হয় নাকি? চল আমি যাচ্ছি। কোথায় সে?

বড়বৌ একটু ইতস্তত করছিল। মা সোজাসুজি বাধা দিলেন, গিয়ে কোনো লাভ হবে না উমা। বৌমা অনেক বুঝিয়েছে। সে শোনবার পাত্তর নয়। তার চেয়ে যার মেয়ে তাকেই আসতে দে।

—বেশ; এইরকম একটা কিছু হবে আমি আগেই জানি। উনি অতিরিক্ত আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়ে রেখে দিয়েছেন।

বড়বৌ ভ্রূ কুঁচকে স্বামীকে শাসন করল। এসব কথা বলা এ বাড়ির রীতি নয়, কারো পক্ষে নিরাপদ নয়। উমানাথও তা জানে। আর কিছু না বলে গজ গজ করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কর্তা যখন ফিরলেন অতিথিরা তার কিছু আগে এসে গেছেন। উমানাথ নিজে উপস্থিত থেকে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে। তবু কোর্টের পোশাকেই ঢুকলেন বৈঠকখানায়। ঠিক সময়ে আসতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন। গোটা বাড়িটা থমথম করছে। কনে দেখাবার আর সব আয়োজন জন সেরে রাখা হয়েছে। শুধু কনে নেই। পড়বার ঘরে দরজা বন্ধ করে কী করছে সে-ই জানে।

স্ত্রীর মুখে ব্যাপারটা একটুখানিক শুনেই রঘুনাথ প্রথম প্রশ্ন করলেন —মা শুনেছেন ?

—না ; ওঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। শুয়ে আছেন। একবার জিজ্ঞেস করছিলেন, এদিকের সব ঠিক তো? আমি বলেছি, হ্যাঁ।

অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন রঘুনাথ। মায়ের ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে একবার দেখলেন তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সাড়া দিলেন না, ভিতরেও গেলেন না। সোজা গিয়ে ছোটমেয়ের দরজায় আস্তে ঘা দিলেন। কোনো সাড়া নেই। দুটো কপাটের মাঝখানে মুখ রেখে আস্তে বললেন, দরজাটা একবার খোল তো মা।

বাবার স্বর শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়ল নন্দা। একটুখানি কী ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খিল খুলে দিল। রঘুনাথ ভিতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। নন্দা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে। কাঁধে হাত রাখতেই ছুটে এসে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল বাবার বুকের উপর।

এলোচুলে সারা পিঠ ঢাকা পড়ে গেছে। তার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন রঘুনাথ। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন অনেকটা শান্ত হয়েছে, মৃদু হেসে বললেন, বোকা মেয়ে। ওঁদের সামনে গিয়ে বসলেই বিয়ে হয়ে যাবে, একথা তোকে কে বলেছে ?

—তাহলে ওরা এসেছে কেন ?

—ও, তা বুঝি জানিস না ? তবে শোন।

বাবার বুক থেকে মুখ তুলল নন্দা। আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাল। রঘুনাথ বললেন, ওরা আমাদের দূরসম্পর্কে কুটুম্ব হয়। তোর মেজদির কি রকম শ্বশুর যেন ভদ্রলোক।

এদিকে আবার আমার অনেক দিনের মক্কেল, খুব জানাশোনা। হঠাৎ একদিন বললেন, আপনার ছোটমেয়েটিকে একবার দেখতে চাই। বুঝলাম ওঁর ছেলের কথা ভেবেই দেখতে চাইছেন। কিন্তু তাই বলে আমি তো তখনই 'না' বলতে পারি না। একে কুটুম্ব তায় বুড়ো মানুষ। দেখতে চান, দেখুন। বিয়ের কথা যদি তোলেন তখন আমার যা বলবার তা বলবো। উনি এসে পড়েছেন। সঙ্গে ওঁর আত্মীয়রা রয়েছেন। এখন তুই যদি একবার গিয়ে না বসিস—

কথাটা শেষ হতে দিল না নন্দা। তার আগেই বলে উঠল—আমি যাচ্ছি বাবা।—তাহলে আর দেরি করিসনে। ওঁরা অনেকক্ষণ বসে আছেন।

চুল বাঁধার সময় ছিল না। তার দরকারও হল না। পাত্রপক্ষ থেকে বলে পাঠানো হয়েছিল মেয়েকে তাঁরা খোলা চুলেই দেখতে চান। একটা ভালো শাড়ি আর দু'চার গাছা গয়না পরিয়ে মুখে সামান্য প্রসাধনের ছোঁয়া বুলিয়ে কনেকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিল বড়বৌ। নন্দা আপত্তি করল না। অন্য সকলে যা-ই জানুক সে তো মনে মনে জানে, সে ওঁদের সামনে পাত্রী হিসাবে যাচ্ছে না, যাচ্ছে, বাবা ওঁদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, কথা দিয়েছেন, শুধু সেই জন্যে। বাবার সম্মান সে কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না।

তাঁরা যে-সব জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন সবগুলোরই শান্ত ভদ্র ও বিনীত উত্তর দিয়েছিল নন্দা। একটি ছোকরা ছিল, বোধহয় পাত্রের বন্ধু। তার প্রতিনিধি হিসাবে সে এসে থাকবে। সোজাসুজি না তাকিয়ে বার বার চোখের কোণ দিয়ে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। মাঝে মাঝে দু-একটা বোকার মতো প্রশ্ন করছিল এবং করতে গিয়ে নিজেই ঘেমে উঠছিল। ভীষণ হাসি পাচ্ছিল নন্দার, রাগও

হচ্ছিল। কিন্তু কোনোটাই প্রকাশ পেতে দেয় নি। চুপ করেও থাকে নি। গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে সব কথারই যা হোক একটা জবাব দিয়েছিল।

সুন্দরী মেয়ে, বুদ্ধি আছে, শান্ত স্বভাব, তবে বয়স অনুযায়ী বাড় বড্ড কম। একজন ডাক্তার ছিলেন দলে। তিনি মন্তব্য করলেন (নন্দা তখন ভিতরে চলে গেছে) একটু আণ্ডার-ডেভেলপ্‌ড্‌ মনে হচ্ছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তো? প্রশ্নটা রঘুনাথের ভালো লাগল না। মৃদু হেসে বললেন, কখনো-সখনো এক-আধটু সর্দি-কাশি তার সঙ্গে একটু টেম্পারেচার, কিংবা হয়তো একটু পেটের গণ্ডগোল—এগুলো হয়ে থাকে। সবারই যেমন হয়। এ ছাড়া আর কোনো অসুখ-বিসুখ আছে বলে তো জানি না। আমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাক্তার গুণেন সরকার। নাম শুনেছেন বোধহয়, প্রায়ই আসেন। ওকেও দেখেন। তিনিও তো কিছু বলেন নি।

পাত্রের বাবা বললেন, সবাই তো আর মোটাসোটা হয় না। যার যে রকম কনস্টিটিউশন। আমার ছেলেও রোগা পাতলা। বয়স কুড়ি বছর তিনমাস, বেশ মানিয়ে যাবে। অর্থাৎ মেয়ে যে তাঁর পছন্দ হয়েছে ঐখানে বসেই জানিয়ে দিলেন ছেলের বাপ এবং রঘুনাথবাবুকে পাত্র দেখতে যাবার অনুরোধ করলেন। রঘুনাথ রাজী হলেন। যাবার তারিখটা তখনই দিতে পারলেন না। এদিকের কাজকর্মের 'অবস্থা দেখে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন বললেন।

বাড়িতে যে একটা সাময়িক গুমোট দেখা দিয়েছিল কেটে গেল। চারদিকে আবার স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে লাগল। বাবার সঙ্গে নন্দার সেদিন যে কী কথা হয়েছিল, আর কেউ তা জানল না। কিন্তু 'বিয়ে

বসবো না' বলে সে যে বেয়াড়া রকম জেদ ধরে বসেছিল সেটা পালটে গেছে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। তার জন্যে সবাই খুশী। 'নন্দারাণী' বরাবরই সকলের চোখের মণি। সেই জায়গায় সে আবার ফিরে এল। বরং আদর-স্নেহের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল।

সাধারণত যা হয়ে থাকে। অভাবগ্রস্ত পরিবারে তো বটেই, বিত্তবান ঘরেও যে মেয়ের দিকে কেউ বিশেষ তাকিয়ে দেখত না, সকলের চোখের আড়ালে খানিকটা অনাদর ও অবহেলার মধ্যে যে মানুষ হচ্ছিল, তার যখন বিয়ের কথা চলতে থাকে এবং সম্বন্ধ ঠিক হয় তার উপরে বাবা-মা-ভাই বোন সারা সংসারের দৃষ্টি হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। সে যেন রাতারাতি নতুন মানুষ হয়ে যায়। যে বন্ধুরা ক্বচিৎ আসত, হয়তো এড়িয়ে চলত, তারাই আবার তাকে নিয়ে মেতে ওঠে। ঠাট্টার সম্পর্ক যাদের সঙ্গে—ঠাকুরমা, দিদিমা, বৌদি, দাদু, ভগ্নীপতি—তাকে ঘিরে হাসি-রসিকতায় সবাই মশগুল হয়ে ওঠেন।

নন্দা তো অনেক আগে থেকেই প্রচুর আদর-আহ্লাদ স্নেহ যত্ন পেয়ে এসেছে। এবার সে বৃহৎ বাঁড়ুজ্যে পরিবারের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল।

মেজদা-মেজবৌদি থাকে বাইরে। নন্দার বিয়ে! কোথায় কবে কী বৃত্তান্ত, বিশদভাবে জানবার জন্যে হঠাৎ এসে পড়ল একদিন। নন্দাকেও একবার নতুন করে দেখা। মেজবৌ গাড়ি থেকে নেমেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকল ওর ঘরে। নন্দা তখন পড়ছিল। হাত ধরে টেনে ওকে তুলল। চিবুকে হাত দিয়ে বলল, এবার তাহলে সত্যিই বিয়ের ফুল ফুটল! দেখি! দেখি! এ কী! মুখখানা এমন গম্ভীর

করে বসে আছ কেন নন্দরাণী ? এত দেরি হচ্ছে কেন, এইজন্যে ? এই তো হল বলে। ক'টা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

নন্দার এসব ভালো লাগছিল না। একটু বিরক্তির সঙ্গেই মেজ-বৌদির হাতটা সরিয়ে দিল। মেজবৌ মনে করল, ছেলেমানুষ। লজ্জা পেয়েছে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। শাশুড়ীকে প্রণাম করে প্রথম কথাই হল—বটঠাকুরঝি, মেজঠাকুরঝিকে দিদি সাজিয়েছিল। নন্দাকে কিন্তু আমি সাজাবো মা।

বড়বৌ কাছেই কোথাও ছিল। এগিয়ে এসে বলল, খুব হয়েছে। আগে নিজে সাজতে শেখ দিকিন। তারপর বিয়ের কনে সাজাতে বসো! কোন্‌দেশী খোঁপা বাঁধা হয়েছে শুনি ?

মেজবৌ খোঁপায় হাত দিল—কেন, কী হয়েছে ?

সুরটা বেশ নরম। অর্থাৎ সে জানে এসব ব্যাপারে সে এখনো আনাড়ী আর বড়বৌ রীতিমতো ওস্তাদ। বিক্রমপুরের মেয়ে। খোঁপা বাঁধতেই জানে দশ না বারো রকম। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের বাড়িতে বিয়ে-ফুলশয্যায় কনে ও বৌ সাজাবার ভার তার প্রায় একচেটে। তা সত্ত্বেও ছোটবৌ তার আগেকার দাবির পুনরুক্তি করতে ছাড়ল না। তবে সেটা অনেকটা আবদারের সুরে। তার মধ্যেও তেমন জোর ছিল না। শাশুড়ী সেটা বুঝলেন। সস্নেহে প্রশ্রয়ের সুরে তিনিই বললেন, বেশ তো, তুমিই সাজিও। বড়বৌমা দেখিয়ে দেবেন। তাছাড়া তার সেদিন একনাগাড়ে কনে সাজাতে হলে চলবেই বা কেন? আমার তো এই গতর নিয়ে নড়তে-চড়তেই বারোমাস। কাজে-কম্মে ডাকতে হাঁকতে সব ব্যাপারেই বড়বৌ। বড় হওয়ার ঝামেলা কি কম মা ? যাক, এবার তুমি হাতে-পায়ে জল দিয়ে কিছু মুখে দাও। রমা কোথায় গেল ? বলে তিনি ব্যস্ত

হয়ে, অর্থাৎ তাঁর স্থূল দেহের পক্ষে যতটা ব্যস্ততা সম্ভব ছোট-ছেলে রমানাথের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

বয়সে না হলেও স্বভাবে ছোটবৌ অনেকখানি ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। চঞ্চল, আমুদে আর ভীষণ হাসিখুশী। শাশুড়ী চলে যেতেই বড় জা-এর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ব্যস, হেরে গেলে তো? একসের রসগোল্লা খাওয়াও।

—কী রকম! জিতলি তুই আর রসগোল্লা খাওয়াবো আমি!

—আমি তো খাওয়াবোই। এতবড় মামলায় জিতে গেলাম। এখন তুমি খাওয়াবে।

—কেন শুনি?

ছোটবৌ গম্ভীরভাবে বেশ ভারিক্কি চালে বলল, কারণ আমি তোমা-দের গেস্ট্।

লেখাপড়ার দৌড় সামান্য। কিন্তু বাইরে থাকার কল্যাণে কথার মধ্যে মাঝে মাঝে এমনি দু একটা ইংরেজী শব্দ ঢুকিয়ে দিতে শিখেছে। বড়বৌ বলল, সে আবার কী?

—গেস্ট্ মানে জানো না? অতিথ, অতিথ।

—ওরে আমার অতিথ রে! যা তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে রান্না-ঘরে চলে আয়। আমার কি আর দাঁড়াবার জো আছে!

ছেলের বাবা স্বয়ং এসে কনে পছন্দ করে গেছেন। ওদিকে ছেলে-টিও, মেজমেয়ের মুখ থেকে যদ্দূর জানা গেছে সকলেরই মোটা-মুটি পছন্দ। শুধু একবার গিয়ে দেখা। আনুষঙ্গিক অন্য সব দিকেও অপছন্দের কোনো কারণ নেই। জানা-শুনো ঘর। ভালো বংশ, অবস্থা

ভালো, লোকও ওরা চমৎকার। তার উপরে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। মেয়ে যেমন লেখাপড়াতে ভালো, ছেলেও অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে। কাজেই এক মাত্র কর্তাকে বাদ দিলে (তাঁর মতিগতি শিবেরও অগম্য) বাড়ির আর সকলের মনে একটা মোটামুটি বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই সম্বন্ধই হবে।

কনের কথা অবশ্য কেউ ভাবেনি। সে যখন শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোলমাল করেনি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিয়ে বসেছিল পাত্র-পক্ষের মুখোমুখি, বেশ ভালোভাবে প্রতিটি কথার উত্তর দিয়েছিল, তখন আর ভাবনা কী? আগে যা কিছু বলেছিল আর করেছিল ওসব নিছক ছেলেমানুষি। ঘাড়ে যদি কোনো ভূত চেপেও থাকে, নেমে গেছে।

বাইরে কোনো আয়োজন দেখা না দিলেও ভিতরে ভিতরে একটা আসন্ন উৎসবের অলক্ষ্য প্রস্তুতি চলছিল। ছোটবৌ এসেই তাকে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিল। উচ্ছ্বাস-আনন্দের সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। চাকর-বাকররাও যোগ দিল তার সঙ্গে।

কিন্তু যিনি আসল ব্যক্তি তাঁর মুখে কোনো রা নেই। এতবড় একটা ব্যাপার। অথচ কোনো কিছুতে গা করছেন বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর যেন কিছুই করবার নেই। একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন। কাজের ভিড় তার বরাবরই। সকালে একরাশ মক্কেল। দশটা বাজতেই কোনোরকমে মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢেলে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে ছুটছেন কোর্টে। ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। তারপর আবার মক্কেল। রাত দশটার আগে ছুটি নেই। মাঝখানে কাছারি থেকে ফিরে জলখাবারের ফাঁকে একটু বিশ্রাম। ঐ সময়েই যা দু-একটা কথা হয় স্ত্রীর সঙ্গে। জরুরী সাংসারিক কথা, যা না বললে নয়।

সেদিন ঐ সুযোগে অন্য কী কথাচ্ছলে বিয়ের প্রসঙ্গটাও পাড়লেন হেমাঙ্গিনী। আর কিছু নয়, ছেলে দেখার কথাটাও শুধু একবার মনে করিয়ে দেওয়া। রঘুনাথ একটা সন্দেশ মুখে পুরেছিলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, আমার খেয়াল আছে। একটু সময় করে উঠতে পারলেই যাবো।

এর পরে আর কথা চলে না। অন্য কারো বেলা হয়তো চলত। বলা যেত, 'নন্দাকে তো ওঁরা দেখে গেছেন এক মাসের ওপর। ভদ্দরলোক নিজে বার বার যেতে বলে গিয়েছিলেন, অ্যাদ্দিন পর্যন্ত না যাওয়াতে হয়তো মনে করছেন আমাদের তেমন ইচ্ছা নেই। ছেলের বিয়ে ওঁরা খুব তাড়াতাড়ি দিতে চাইছেন। ছেলেটিকে দেখে 'হ্যাঁ' 'না' যেটা হোক জানিয়ে দিলে ভালো হয়'। আরো বলা যেত, 'এদিকে মা-র অবস্থাও খুব ভালো বলা চলে না। ও পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করে গ্যাছে, সেকথা তো শুনেছেন। তারপর থেকে রোজই তাগিদ দিচ্ছেন, ছেলে দেখার কী হল? এটা ওটা বলে ঠেকিয়ে রাখছি'।

এ সবই মনে মনে রইল। বলা হল না। এতগুলো কথা স্বামীকে একসঙ্গে বলতে পেরেছেন, তেমন ঘটনা তাঁর জীবনে কোনোদিন ঘটেছে বলে মনে করতে পারলেন না হেমাঙ্গিনী। তাই সেদিনও বৃথা চেষ্টা না করে চুপ করে রইলেন।

আগে যেমন রোজ একবার করে মাকে দেখতে যেতেন রঘুনাথ, এখনো তেমনি যান। দু-একটা কথাও হয়। কেমন আছ আজ? মা তার উত্তরে কখনো বলেন, আছি একরকম, কখনো বলেন গেলেই বাঁচি

কোনো কারণে কিংবা অনেক সময় বিনা কারণে কারো উপরে

একটু বেশী রাগ বা অভিমান যেদিন হয়, সেদিন নানা রকম খেদোক্তি করে থাকেন—থাকা মানেই তো সবাইকে কষ্ট দেওয়া। পোড়া যম যে এদিকে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। কোনো কোনোদিন ভাষাটা একটু আলাদা—দেখতেই তো পাচ্ছ, দিব্যি আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি শুয়ে আছি। মরণ কি অত সহজে আসে? সে ভাগ্যি করে তো আসি নি। ইত্যাদি।

রঘুনাথ এ সবের কোনো উত্তর দেন না। স্ত্রী বা পুত্রবধূ যে-ই উপস্থিত থাকে তার কাছে খোঁজখবর নেন, ওষুধপথ্য ঠিকমতো চলছে কিনা। মা আবার ডাক্তারি ওষুধ খান না। শহরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ গিরিশ চন্দ্র সেন রোজ একবার আসেন। ওষুধ সামান্য। কোনো বটিকা চূর্ণ অরিষ্ট কিংবা রসায়ন। কিন্তু অনুপানের ঝঞ্ঝাট অনেক। ছ্যাঁচা বাটা হামানদিস্তায় কোটা কিংবা খলে ফেলে মধু দিয়ে মাড়া। ফোটাবার ব্যাপারও থাকে মাঝে মাঝে। সোয়া সের জলে চড়িয়ে আধ ছটাক থাকতে নামাতে হবে। সে-সব করার জন্যে সব সময়ের বাঁধা লোক আছে—বাইশার মা। অনেক দিনের লোক। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা। কর্তামার যখন যা দরকার সব জানে এবং প্রাণ দিয়ে করে।

স্ত্রীর সঙ্গে যেদিন কথা হল তার চার পাঁচ দিন পর মা-র ঘরে ঢুকে রঘুনাথ দেখলেন তিনি দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন মনে করে চলে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধা হঠাৎ এদিকে ফিরে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, তুই কী ভেবেছিস বল তো?

রঘুনাথ জবাব দিলেন না। এটা তো গেল ভূমিকা। আসল অভি-যোগের অপেক্ষায় রইলেন। সেটা তখনই এল—মেয়েটার বিয়ে দিবি, না দিবি না?

—দেবো বৈ কি মা!

—তাহলে ছেলে দেখতে যাচ্ছিস না কেন?

রঘুনাথ বসলেন। মিনিটখানেক মাথা নীচু করে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন আজই কাছারি থেকে ফিরে জানিয়ে দেবো ভাবছিলাম। কিন্তু কথাটা যখন পাড়লে, এখনই বলি। এ বিয়ে হবে না।

—হবে না! কেন?—উঠে বসবার চেষ্টা করলেন মা।

—না, না, তুমি উঠো না। ঠাণ্ডা হয়ে শোনো। হবে না এইজন্যে যে আমি যে রকমটা চাইছি, এরা ঠিক তা নয়।

—কেন কী দোষ করল এরা?

—দোষের কথা তো বলি নি। ভালো সম্বন্ধ। কিন্তু আমার পছন্দ নয়।

—তার মানে তোমার মেয়ের বিয়ে দেখা আমার কপালে নেই, বৌমা।

ছেলের দিক থেকে পুত্রবধূর দিকে মুখ ফেরালেন। তিনি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কপালের নীচে পর্যন্ত ঘোমটা টানা।

—বিয়ে তোমরা দেবে। আমি দেখতে পাবো না···বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বৌমার চোখ দুটোও ছলছল করে উঠল। রঘুনাথের দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গেলেন মনে হল, কিন্তু বললেন না। শাশুড়ীর সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। এ বাড়ির সেটা রীতি নয়। ঐ রকম একটা গভীর, উত্তেজক মুহূর্তে হয়তো হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়তেই থেমে গেলেন। কিন্তু চোখ দুটো আর ফেরালেন না। রঘুনাথ যদি একবার স্ত্রীর দিকে তখন তাকাতেন দেখতে পেতেন সেই বাষ্পময় দৃষ্টির ভিতর থেকে শুধু অভিমান নয়, তার সঙ্গে ঠিকরে পড়ছে একটা তীব্র তিরস্কার

—একী করছ তুমি? তোমার মা! জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রাণটা বুকের কাছে ধুক ধুক করছে, যে-কোনো মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। চোখের ওপর দেখেও তাঁর এই একটিমাত্র অন্তিম ইচ্ছা তুমি মেটাতে পার না!

রঘুনাথ স্ত্রীর মুখের পানে না তাকিয়েও হয়তো সব দেখতে পেলেন, তাঁর নীরব অভিযোগও শুনতে পেলেন। তাছাড়া, এর ভিতরে এমন একটি কথাও নেই যা তিনি জানেন না বা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন না।

চিবুকের নীচে ডান হাতের তর্জনী রেখে মাটির দিকে চেয়ে আরো কিছুক্ষণ মায়ের রোগশয্যার পাশে বসে রইলেন রঘুনাথ। মা তখন আর কাঁদছেন না, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন। সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

৩

সাধুচরণ ঘোষাল রঘুনাথের মুহুরী। ঢুকেছিল তাঁর বাবার আমলে। তাঁর হাতেই কাজ শেখা। তিনি নরম মানুষ ছিলেন। খাটতেন প্রচুর। মক্কেলের স্বার্থ কোনো রকমে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু টাকাকড়ির ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে পারতেন না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধত, তাঁর সমব্যবসায়ীরা সকলে না হলেও অনেকে যেটা সবার আগে বর্জন করে থাকেন। ফলে দেখা যেত মক্কেলের দক্ষিণ হস্ত উকিলবাবুর পদধূলি গ্রহণে যেমন অগ্রসর, তাঁর দক্ষিণার বেলায় তেমনি কুণ্ঠিত।

সাধুচরণ প্রথম প্রথম কিছুদিন নিঃশব্দে লক্ষ্য করল। তারপর মাঝে মাঝে মনিবকে বলতে শুরু করল, ঐ লোকটা দশ টাকা কম দিয়ে

গেল বাবু, অমুকে আমাদের ঠকাচ্ছে, তমুকের বেলায় আর একটু কড়া হতে হবে। 'মনিব' যে বুঝতেন না, তা নয়। মাঝে মাঝে তিনি সজাগ হয়েও উঠতেন, ঠিক বলেছ। এবার থেকে পুরো টাকা না দিলে কাউকে ছাড়া হবে না। দু-চারদিন একটু শক্ত হতেন, আগেই বলে দিতেন এত দিতে হবে সেইটাই আদায় করতেন। তারপর আবার যে-কে সেই। কেউ একটু ধরাধরি করলেই অনেকখানি পার পেয়ে যেত। কখনো কখনো আবার কোনো কোনো মক্কেলের পক্ষ টেনে বলতেন, ওর বেশী বোধহয় দিতে পারবে না, সাধু। ওদিকেও অনেক খরচ হচ্ছে। ঘোষালের যুক্তি হল—ওদিকে যদি হয়, আমাদের দিকে হবে না কেন? আর-কেউ যদি না ছাড়ে আমরা কেন ছাড়বো? কথাগুলো মনিবের মুখের উপর স্পষ্টভাবে না বললেও, মনোভাবটা বুঝিয়ে দিত।

আস্তে আস্তে—ততদিনে ঘোষাল ওকালতির কাজকর্ম অনেকটা শিখে নিয়েছে, আটঘাটও বুঝে ফেলেছে—টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো মুহুরীর হাতে গিয়ে দাঁড়াল। কখন কার কাছ থেকে কী নিতে হবে, কে কত দিল, আর কার কত বাকী রইল সে সব হিসাবও তার কাছে। পেমেণ্ট অর্থাৎ টাকা আদায়টাও হত 'বাবুর' সামনে। ক্রমে সে ভারও তিনি অনেক ক্ষেত্রে সাধুচরণের উপর ছেড়ে দিলেন। দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। অনেকদিন ওকে দেখে চরিয়ে বাজিয়ে এবং অভিজ্ঞ ও পাকা উকিলের দৃষ্টি দিয়ে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, সাধু মনিবের বেলায় তো নয়ই মক্কেলের বেলাতেও কোনো অসাধু উপায় নেবার লোক নয়। মানুষটা খাঁটি। কারো কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্যের একটি পয়সা ও যেমন ছাড়বে না, তেমনি প্রাপ্যের চেয়ে একটি পয়সাও বেশী নেবে না। টাকা

আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো মক্কেলের উপর সাধুচরণ কিছুটা পীড়ন করে থাকে, এ রকম একটা তুর্নাম তার ছিল। ঠিক পীড়ন না হলেও লোক বুঝে কারো কারো ক্ষেত্রে সে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত তাকে ঠিক সভ্য বা শালীন বলা চলে না।

একদিন এক মক্কেল এল। দূর গ্রামে বাড়ি। গ্রামের নামটা সাধু-চরণের চেনা। ওদের সেরেস্তায় মামলা করে গেছে এমন তু'একজনের নামও জানা ছিল। শুনে লোকটির আগ্রহ বাড়ল। জমি বন্ধক রেখে টাকা দিয়েছিল কাকে। চড়া সুদ। কয়েক বছর ধরে সেটাই কোনো রকমে চালিয়ে এসেছে খাতক। 'আসলে'র ঘরে এক পয়-সাও জমা পড়ে নি। এদিকে খতের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। মামলা করলে জমিটা হাতে এসে যাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

উকিলবাবু কোর্টে। সাধু এসব ব্যাপারে পাকা লোক। কাগজপত্র দেখে নিয়ে কথাবার্তা চালাতে লাগল। 'ফী'-এর কথা শুনে মক্কে-লের প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। জোড়হাত করে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমি গরীব মানুষ। এট্টু কম-শম কইর‍্যা ন্যান কত্তা!

চেহারা দেখে অবশ্য মনে হবে সত্যিই খুব গরীব, কোনো রকমে দিন চলে কি চলে না। পরনে ন'হাতি ময়লা ধুতি। শার্টের গলার কাছটা ছেঁড়া, বোতামের বালাই নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খালি পা। কিন্তু সাধুচরণ এদের চেনে। বাইরে শুকনো হলেও ভিতরে শাঁস আছে। ঘরের মেঝে খুঁড়লে বেরিয়ে পড়বে সরা ঢাকা মাটির হাঁড়ি (ওরা বলে পাতিল), তার মধ্যে কয়েক বাণ্ডিল চকচকে নোট। এখনো লোকের ঘরে পাট আছে। সুতরাং সুদ আদায়ও পুরোদমে চলেছে।

সাধুচরণ তার দাবি থেকে একচুলও নড়বে না। মক্কেলও তার

অর্ধেকের উপরে উঠবে না, এবং সেই টাকাটাই সে ছেঁড়া শার্টের তলায় ফতুয়ার বুকপকেট থেকে বের করে রাখল। সাধু সেদিকে ফিরেও দেখল না। মক্কেল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কাপড়ের কষিটা ঢিলে করে তলপেটে কোঁচার সঙ্গে রেখে বলল, ছ্যান, যা আছিল ঝাইড়া থুইলাম আপনের সামনে। দিয়্যাই কোনো রকমে কামডা কইর‍্যা দ্যান মুউরি বাবু।

দুচোখে তার কাতর অনুনয়। কিন্তু ঘোষাল নির্বিকার। অনাবশ্যক ভাবে কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল। তাই করে চলল। লোকটি এবার আচম্বিতে টেবিলের তলায় ঢুকে দুহাতে সাধুচরণের পা চেপে ধরল—আপনার পা ছুঁইয়া কইতেছি, মুউরিবাবু আমার আর কিছু নাই। খালি দুইটা পয়সা রাইখ্যা দিছি খ্যাওয়া পারের জন্যে।

সাধুচরণ পা ছাড়াবার চেষ্টা করল না। বসে বসেই হুকুমের সুরে বলল, বেরিয়ে এসো। লোকটা ভয়ে ভয়ে উঠে এসে দাঁড়াল তার সামনে। সাধু একটু হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর সহজ মৃদুস্বরে বলল, কাছাটা দেখি।

এ হেন মানহানিকর প্রস্তাবেও মক্কেল চটল না বা প্রতিবাদ জানাল না। শুধু খানিকটা আহত অভিমানের সুরে বলল, আমারে আপনি বিশ্বাস করলেন না কত্তা? কাছার মধ্যে ট্যাহা লুকাইয়া রাইখ্যা আপনার কাছে আমি মিছে কথা কইতেছি?

সাধুচরণ সেটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল বলে মনে হল না। আগের মতোই বলল, একবার খোল না? এখানে তো লোকজন কেউ নেই।

মক্কেলটি তেমনি গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো সাড়া নেই। সাধু এবার উঠে পড়ল। লোকটির পিছন দিকে সরে গিয়ে মুচকি

হেসে বলল, তোমার যখন অত আপত্তি, আমিই না হয় একটু দেখি একবার।···

হাতটা একটু বাড়াইতে তড়াক করে ফিরে দাঁড়াল লোকটা এবং ক্রুদ্ধভঙ্গিতে এক ঝটকায় কাছাটা খুলে ফেলল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন উকিলবাবু। দৃশ্যটা দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। ঘোষাল বোধহয় মনিবকে দেখে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে থাকবে। ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল নিজের চেয়ারের পাশে। মক্কেলটি তখন তেমনি রাগত মুখেই কাছার গিঁট খুলে একটা দু-তিন ভাঁজ করা দোমড়ানো নোটের বাণ্ডিল বের করল এবং গুণে গুণে কয়েকখানা আগের টাকার মধ্যে রেখে ফী-টা পুরো করে দিল।

আর কোনো দিকে তাকাল না। মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারও তো একটা লজ্জাবোধ আছে।

যুবক রঘুনাথ যখন কাছারি যাতায়াত শুরু করলেন, তখন সাধুচরণ শুধু তাঁর বাবার মুহুরী গোমস্তা বা খাজাঞ্চি নয়, সাংসারিক বিলি-ব্যবস্থা-খরচপত্রের ব্যাপারেও বলতে গেলে কত্তার পরেই তার স্থান। অন্তঃপুরে অবারিতদ্বার। 'কত্তামা' তাকে যখন তখন ডেকে পাঠান এবং টাকাপয়সা সংক্রান্ত যা কিছু প্রয়োজন তাকেই বলেন। সাধুই সেগুলো মেটায়; মনিবের একটা অনুমতি সুবিধা মতো নিয়ে নেয়। অনেক সময় তাঁর অনুমতি না নিয়েও অর্থাৎ তাঁর অজানতেও কিছু কিছু কাজ তাকে করতে হয়।

রঘুনাথের চেয়ে সাধু বয়সে বড়। তাকে ঘোষালকাকা বলে ডাকতেন এবং খানিকটা সমীহ করে চলতেন। দরকার মতো টাকা-পয়সা চেয়ে নিতেন। ওকালতির প্রথম পাঠও নিয়েছিলেন ঘোষালকাকার কাছ থেকে। যখন খানিকটা দাঁড়িয়ে গেছেন তখনো কোনো কোনো

বিষয়ে সাধু তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তার মতামত জানতে চাইতেন।

কর্তার মৃত্যুর পর রঘুনাথ যখন মনিব হয়ে বসলেন এবং বাবার চেয়েও দ্রুততর বেগে উন্নতির পথে উঠতে লাগলেন, তখন সাধু-চরণও তার কাজ-কর্মের সীমা ও ধারাগুলো এক-আধটু অদল-বদল করে নিল। বাস্তব-বুদ্ধি ও এতদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল আগের মনিবের সঙ্গে এখনকার মনিবের মৌলিক তফাত। এর একটা ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব মতামত আছে এবং একবার যে সিদ্ধান্ত নেন, অন্যের কথায় বদলান না, সেইটাই আঁকড়ে ধরে থাকেন। বুড়ো কর্তাকে বাড়ির লোকেরা খুব একটা আমল দিত না, একে রীতিমতো ভয় করে। এমন কি কর্তামাও তাঁর পুরনো দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তির এলাকা অনেকখানি গুটিয়ে ফেলেছেন। স্বামীকে তিনিই চালাতেন, কিন্তু পুত্রের বেলায় দেখলেন তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু নিজেকে নয়, অন্য সকলকেও চালাতে জানে। তবু রঘুনাথ অন্যত্র যতই দৃঢ় হোক মা-র কাছে নরম। মা-র ইচ্ছাকে তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে থাকেন এ কাহিনীর গোড়ার দিকেই তা বলা হয়েছে।

সাধুচরণ এখনো রঘুনাথের ঘোষালকাকা, কিন্তু কোর্ট-সংক্রান্ত কাজ-কর্মে তার কর্তৃত্বের সীমানা আপনা থেকেই নির্ধারিত হয়ে গেল। ব্যক্তিগত সম্পর্কে সে আগের মতোই বাঁড়ুজ্যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাদের সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদের সেও অংশীদার, তাদের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সেদিক দিয়ে রঘুনাথ তাকে বরং আগের চেয়েও আরো বিশ্বস্ত, সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেন।

ভুল

সংসারে সব মানুষই কোনো না কোনো দিক দিয়ে বঞ্চিত। রায়-সাহেব রঘুনাথ ব্যানার্জিব সব আছে,কিন্তু এক জায়গায় অভাব। তিনি ঘরে-বাইরে আনুগত্য পেয়েছেন, কিন্তু বন্ধুত্ব পান নি। হয়তো তাঁব পরিবারে সবচেয়ে নিকট ও বলতে গেলে একমাত্র বন্ধু তার মুহুরী সাধুচরণ ঘোষাল। -

সাধু সকলেরই প্রিয়। একমাত্র কত্তামা তার নাম ধরে ডাকেন। আর সকলের কাছে সে ঘোষালকাকা ও ঘোষালদাদু। যার যা প্রাপ্য সে সমান ভাবে দেয়। কত্তার মনের কথা তো দেবাঃ ন জানন্তি। তবু একমাত্র এই ঘোষালের কাছ থেকেই তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। পারিবারিক স্বার্থ, প্রয়োজন ও কল্যাণের দিকে চেয়ে সে-ও ততটুকু দেয় যতটুকু দিলে মনিবের কাছে সে আস্থা হারাবে না।

এমনি একটি খবর দেবাব জন্যেই সে মনিব-পত্নীর সঙ্গে গোপনে দেখা করল। মা ও স্ত্রীর কাছ থেকে সেই তীব্র অভিযোগ (প্রথমটা ব্যক্ত ও দ্বিতীয়টা অব্যক্ত) নিঃশব্দে বহন করে যেদিন তিনি মায়েব রোগশয্যার পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন, তার দিন কয়েক পবেব কথা। সাবা বাড়িতে একটা গভীর থমথমে ভাব চলছে। কাবো মুখে হাসি নেই, কথাও নেই বললেই চলে। কাজকর্মের প্রয়োজনে যেটুকু না বললে নয়। সাধুচরণ ও সংসারের একজন। নন্দার বিয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ, আনন্দ উৎসাহ কাবো চেয়ে কম নয়। নন্দা গোড়াব দিকে এ নিয়ে যে সব কাণ্ড বাধিয়েছিল সবটাই নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়, তার কোনো গুরুত্ব নেই, এই ভেবেই সে নিশ্চিন্ত ছিল। দেখা ও গেল তাই। বাবা গিয়ে মেয়েকে একবাব বলতেই তো মেয়ে অমনি সুড়সুড় কবে কনে সেজে বৈঠকখানায়

গিয়ে বসলেন। আসলে মেয়েটা একটু বেয়াড়া; অতিরিক্ত আদর পেলে যা হয়।

সব তো বেশ ভালোভাবেই চলছিল। হঠাৎ রঘুনাথ কেন বিগড়ে গেলেন, আপনা-আপনির মধ্যে এমন একটা ভালো সম্বন্ধ কাউকে কিছু না বলে নাকচ করে দিলেন, সাধুর কাছে সেটা শুধু দুর্বোধ্য নয়, দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পারিবারিক ব্যাপারে রঘুনাথ অনেক সময়ে 'ঘোষালকাকার' সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাকে তো একবার ডাকতে পারতেন। তার মতামত গ্রহণ না করুন, জানাতে পারতেন এই আমি করতে যাচ্ছি। কিন্তু কিছুই বলেন নি। সে-জন্যে সাধুর মনে একটা সূক্ষ্ম অভিমানও ছিল—মরুকগে, যার মেয়ে, সে যা ভালো বোঝে করুক। আমি কে ? আমার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার ?

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই বাঁড়ুজ্যে বাড়ির নিমক খেয়েছে সাধুচরণ। সেই বুড়োকর্তার আমল থেকে এদের স্নেহ ভালোবাসাই শুধু পায় নি। পেয়েছে তার চেয়েও যেটা বড় জিনিস—আস্থা। বৈষয়িক দিক থেকেও সে এই বাড়ির কাছে আজীবন ঋণী। একজন উকিলের মুহুরির প্রাপ্য আর কতটুকু! মাসান্তে হিসাব করে সে ক'টা টাকা সেরেস্তা থেকেই নিয়মিত তুলে নিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়িতে। কিন্তু হিসাবের বাইরে যা পেয়েছে, তার কোনো নিয়ম বা সময়-অসময় সে আমলেও ছিল না, এ আমলেও নেই। অসুখে বিসুখে, আপদে বিপদে বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনে যে প্রাপ্তি, তার প্রত্যাশাকে প্রতিবার ছাড়িয়ে গেছে। সেটা এসেছে নানা হাত থেকে নানা নামে এবং নানা রূপে—'এই টাকাটা রেখে দাও

সাধু', 'এই শাড়িখানা তোমার মেয়ের জন্যে, এটা তার মার', 'আপনার মেয়ের বিয়েতে যেতে পারছি না ঘোষালকাকা, সামান্য আশীর্বাদি এখান থেকেই দিলাম', 'এটা আপনার ছেলের পৈতের নামমাত্তর ব্রতভিক্ষা'। এদের কাছে হয়তো 'সামান্য' বা 'নামমাত্তর' কিন্তু সাধুচরণের কাছে অনেক।

শুধু কি এই? এসব দেওয়ার পিছনে তবু একটা উপলক্ষ রয়ে গেছে। 'দান', কিন্তু অন্য নামে। যাকে সরাসরি অর্থ-সাহায্য বলে তাও কতবার হাত পেতে নিয়েছে সাধুচরণ। সেখানেও দাতার তরফ থেকে 'ধার' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, পাছে গ্রহীতার মনে লাগে। কিন্তু সেটা যে শুধু কথার অন্তরাল, আসলে যে ধার শোধ দেবার জন্যে নয়, সে বিষয়ে উভয় পক্ষই ওয়াকিফহাল।

সুতরাং সাধুচরণের 'সূক্ষ্ম অভিমান' শেষ পর্যন্ত টিকল না। যার সঙ্গে তার এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেই বাঁড়ুজ্যে বাড়ির মাথার উপর ঘনায়মান মেঘের ছায়া তাকে স্থির থাকতে দিল না। কোর্ট থেকে মনিবের সঙ্গে একই গাড়িতে ফিরছিল সেদিন। ঘোড়ার গাড়ি। মোটরের তুলনায় তার মস্ত বড় সুবিধা হল, চালকের আসন চোখ-কান দুটোই পাল্লার বাইরে থাকায় একান্তে কথা-বার্তা বলা চলে। তাছাড়া রঘুনাথকে একা পেতে হলে এইটাই সবচেয়ে ভালো স্থান। কাছারির সেরেস্তা এবং বাড়ির বৈঠকখানায় একগাদা লোক তাকে সর্বদাই ঘিরে আছে।

মামলা সম্বন্ধে দু-একটা কথা সেরে নিয়ে সাধুচরণ হঠাৎ নন্দার বিয়ের প্রসঙ্গ পেড়ে বসল—এ সম্বন্ধটা না হয়ে ভালোই হয়েছে। ছেলেটিকে আমি একদিন দেখেছি। ওর বাবার চিঠি নিয়ে আমা-দের সেরেস্তায় এসেছিল। নন্দাদির সাথে মানাত না।

আসলে বাড়ির অন্য সকলের মতো এ সম্বন্ধ সাধুচরণেরও মোটা-মুটি পছন্দ হয়েছিল, এবং ছেলেকে সে কখনো দেখে নি। এই মিথ্যা-চরণের উদ্দেশ্য মনিবের মন রাখা অর্থাৎ তার মতে সায় দেওয়া। ভূমিকা হিসাবে তার প্রয়োজন ছিল। কিছুটা ফল ফলল। রঘু-নাথ একটু অবাক হলেন, ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন নাকি?

—ঐ যাকে বলে এক নজর। তখন তো বিয়ের কথাবার্তা হয় নি।

—নন্দার সঙ্গে মানাত না বলছেন?

—দেখে আমার তাই মনে হল।

রঘুনাথ অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর মন হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা সমর্থন খুঁজছিল। বললেন, আমি অবিশ্যি অন্য দু-একটা কথা ভেবে ওদিকে আর এগোলাম না। ছেলে যদি পছন্দ-মতো না হয়, তাহলে কোনো কথাই নেই।

সাধুচরণের বুকটা তখন ঢিপঢিপ করছে। মনিব যদি তার এই নতুন মত অন্দরে গিয়ে প্রকাশ করেন, সেখানে তার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে! একমাত্র ভরসা, রঘুনাথ সে ধরনের লোক নন। যাই হোক, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। সত্য হোক মিথ্যা হোক কথাটা যখন মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, যা হবার হবে। এবার আসল বক্তব্য তুলল সাধুচরণ—এখন তাহলে নতুন সম্বন্ধ খুঁজতে হয়।

—হ্যাঁ; আপনাকে আজ-কালই বলবো ভাবছিলাম। একটা ঘটক দেখুন। ও লোকটা তেমন কাজের নয়।

—কালই দেখছি। ঘটকের অভাব কী?

সেই রাত্রেই সে সুযোগ করে একান্তে দেখা করল নন্দার মার সঙ্গে এবং এই সুখবরটা জানিয়ে দিল। দু-তিন দিনের মধ্যে এটা

আর গোপন রইল না। সকলেই জানল এবং দেখল যে বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে আবার ঘটক আসতে শুরু করেছে। এলে কি হয়? কথা-বার্তা যা কিছু ঐ এক জায়গায়। কর্তা ও তাই বলে দিয়েছেন। খবরা-খবর যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাত্রি বেলা একটা সময়ও সে জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তখন আর কেউ থাকে না সেখানে শুধু ঘটক আর তিনি। দরজা জানালা বন্ধ। দেখে শুনে চারদিকে শুরু হয় কানাঘুষো মুখ-চাওয়াচাওয়ি। এবাড়ির কি সবই অদ্ভুত? মেয়ের বিয়ে হবে। ঘটক সম্বন্ধ নিয়ে আসছে। তার মধ্যে লুকোচুরির কী আছে? এ বিষয়ে সকলেই উৎসুক। সেই জন্যে সর্বত্রই ঘটক নামক ব্যক্তিটির অবাধ যাতা-য়াত। অন্তঃপুরেও তার ডাক পড়ে। যে-সব তথ্য সে নিয়ে আসে তার আলোচনা চলে পারিবারিক আসরে। বাড়ির লোকেরা তো থাকবেই আত্মীয়-স্বজনরাও আসে, মতামত দেয়। বিয়ে মানেই দশ জনের ব্যাপার। ঘটকালি পর্ব তার সূচনা। সেখান থেকেই সবাই তাতে অংশ নেবে। যার যা বক্তব্য জানাবে। হিন্দুর ঘরে এই রীতিই চলে আসছে বরাবর। এই বাড়িতেও এতদিন তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এবারে কী হল! ঘটক আসছে, বাড়ির কর্তার সঙ্গে গুজ-গুজ করে চলে যাচ্ছে। তিনিও কাউকে একটি কথাও বলছেন না। এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড কে কোথায় দেখেছে!

সাধুচরণের উপর চাপ পড়ছে। গৃহিণী ডেকে নিয়ে বলছেন, ব্যাপার কী ঘোষালকাকা?

—কী জানি? হাত উলটে বলে ঘোষাল, জানতে পারলেই সব আপনাকে জানাবো মা।

সেই দিনই রাত দশটা নাগাত ঘটক যখন চলে যাচ্ছে বাড়ির

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সাধু। ঘটককে চেপে ধরল, "অত কী গোপন পরামর্শ হচ্ছে কত্তার সাথে?
সে-ও বেশ বিরক্ত—আর পারছি না দাদা। এত সম্বন্ধ আসছে। কোনোটাই ওঁর পছন্দ নয়।
—কেন? কী চাইছেন বাবু?
—পরে বলবো, বলে এড়িয়ে গেল।
কোনো একটা মুসলিম পর্ব উপলক্ষে আদালত ছুটি। রঘুনাথ সকালে উঠে স্ত্রীকে বললেন, মুন্সীগঞ্জে যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হবে।
—মক্কেলের কাজে বুঝি? তাহলে খেয়ে-দেয়ে যাও। আমি ঠাকুরকে বলছি, তাড়াতাড়ি ছুটো—
—না, মক্কেলের কাজে নয়। ঘটক একটা নতুন সম্বন্ধ এনেছে। সেই ব্যাপারে যাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই সেরে নেবো।
কথাটা সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, নন্দার কানেও পৌঁছল। ইদানীং যে আবার ঘন ঘন ঘটকের আনাগোনা চলছে সে খবরও তার অজানা ছিল না। তা নিয়ে সে-ও কাউকে কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করে নি। ব্যাপারটা একটু দানা না বাঁধলে কাকে বলবার আছেই বা কী? তার সেই মতামতের গোলমাল তো আগেই মিটে গেছে।

রঘুনাথ গিয়ে উঠলেন তাঁর এক পুরনো সহপাঠীর বাড়ি। এক সঙ্গে আই. এস. সি. পড়েছেন ঢাকা কলেজে। দুজনেই বেশ মেধাবী ছাত্র। বন্ধুত্বও ছিল খুব গভীর। তারপর বীরেশ্বর মুখুজ্যে গেলেন ডাক্তারি পড়তে, রঘুনাথ ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি

হলেন। বাবার একান্ত ইচ্ছা তিনি উকিল হন, যাতে করে নিজের জায়গাতেই ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে যেতে পারেন। সেই থেকে ছাড়াছাড়ি। বীরেশ্বর এম. বি. পাস করে মুন্সীগঞ্জেই ডিস্‌পেন্‌সারি দিয়ে বসলেন। ওখানে ওঁর পৈতৃক বাড়ি। কিন্তু রঘুনাথ যেমন নিজের প্রতিভায় ও পিতার আনুকুল্যে ধাপে ধাপে সাফল্যের উচ্চাসনে গিয়ে উঠলেন বীরেশ্বর ততটা পারেন নি। ছোট শহরের অন্যতম ভালো ডাক্তার। কিন্তু এই ব্যবসায়িক প্রভেদ বা অবস্থার তফাত ওঁদের বন্ধুত্বের গায়ে কোনো দাগ কাটতে পারে নি। দেখাশুনা বড় একটা হয় না। বীরেশ্বরবাবুর ঢাকা যাবার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। রঘুনাথবাবুকে কখনো কোনো ধনী মক্কেলের ডাকে মুন্সীগঞ্জে আসতে হয়। সব বারে পেরে ওঠেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে সময় করে বন্ধুর বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে যান।

বীরেশ্বরের বড়ছেলে তখন কলকাতা থেকে এম. এ. ল. পাস করে নিজেদের শহরেই প্রাক্‌টিস্ শুরু করেছে। কোনো বড় জায়গায় গিয়ে বসতে হলে যে আনুষঙ্গিক আয়োজন দরকার আপাতত সেটা যোগাবার মতো সঙ্গতির অভাব। এখানে কিছুটা স্থানীয় চেনাজানা প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবিধা আছে। কিছুদিন চলুক। তারপর যদি খানিকটা দাঁড়িয়ে যেতে পারে তখন বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে তাকানো যেতে পারে। এ বিষয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়? প্রশ্নটা যে বীরেশ্বরের মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু উপস্থিত মতো সেটা মনে মনেই রেখে দিয়েছেন। একটু মুখচোরা প্রকৃতির লোক। তাছাড়া কোনো কিছু চটপট করে ফেলবার মতো তৎপরতার অভাব আছে। এইসব বাধা কাটিয়ে বলি বলি করেও তিনি কিছু বলেন নি।

এদিকে বাড়ির বড় ছেলে সুপ্রকাশ। বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। প্রাকটিস্‌ও হয়ে গেল কয়েক বছর। এতদিনে বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ছেলেও যে কোনো রকম অনিচ্ছা প্রকাশ করছে তা নয়। বরং এক জ্যাঠতুতো বৌদির কাছে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে, তাকে আগ্রহই বলা যায়। বৌদি সেটা আর গোপন রাখেনি। বেশ জোর দিয়েই খুড়শাশুড়ীকে বলে গেছে, ঠাকুরপোর বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন, কাকীমা। তিনি নিজেও তার গুরুত্ব বোঝেন এবং এতদিনে একেবারে বসে ছিলেন না। কিন্তু কর্তার নিড়বিড়ে স্বভাবের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিলেন না। পাত্রীর সন্ধান চলল। এর ওব তার উপর নির্ভর না করে গৃহিণী নিজে থেকেই ঘটক লাগালেন।

অনেকদিন পরে রঘুনাথকে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখে বীরেশ্বর যেমন খুশী তেমনি চমকিত। সকালের দিকে তাকে কোনোদিন দেখা যায় নি। যখনই এসেছেন বিকেলে কোর্ট-ফেরত। আজ তো কোর্টও বন্ধ।

উভয় তরফের কুশল প্রশ্নাদির পর রঘুনাথ বললেন, বৌঠানকে বলে পাঠাও এ বেলার মতো দুটো খেতে দিতে হবে।

—তুমি যে এসেছ, সে খবর যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। আর ফারদার নোটিসের দরকার নেই।

—কিন্তু একটা কথা জানানো দরকার।

—কী?

—একরাশ ভাজাভুজি ডাল ডালনা মাছ মাংস দই মিষ্টি—একটার পর একটা আসছে তো আসছেই—আমাদের বাঙালী সংসারের যা হয়ে থাকে, সে সব চলবে না। সিম্পল মাছের ঝোল আর ভাত।

সঙ্গে একটু দুধ কিংবা ঘরেপাতা দই (যদি থাকে)। ব্যাস্।

বীরেশ্বর কয়েক সেকেণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি; তোমাকে বোধহয় 'আধুনিক' রোগে ধরেছে।

—সেটা আবার কী ?

—খাওয়া কমিয়ে 'সিলিম' হতে হবে। প্রকোপটা মেয়েমহলেই বেশী, তবে ছেলেদের মধ্যেও ছড়াচ্ছে।

—না ভাই, 'সিলিম' হবার বাসনা আমার নেই। এক ছিলিম তামাক বরং দিতে পার। সে সব পাট আছে তো ?

—আছে, আছে। ঘাবড়াচ্ছ কেন ?

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাঁর আসল বক্তব্য শুরু করলেন রঘুনাথ —

ছেলের বিয়ে দিচ্ছ শুনলাম ?

—হ্যাঁ ; খোঁজখবর নিচ্ছি। তোমাকে কে বললে ?

—নীলাম্বর ঘটক।

—ও, আচ্ছা। তোমার জানাশুনো আছে নাকি কোনো মেয়ে ?

—আছে।

—কোথায় ? কার মেয়ে ?

—আমার।

বীরেশ্বর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাঁ ! বল কী! তোমার মেয়ে ? মানে ছোটটি ? কী নাম যেন তার ?

—নন্দা !

—ও, হ্যাঁ; আমি যখন দেখেছি, বড্ড ছোট! সে তো অনেক দিনের কথা। অ্যাদ্দিনে বিয়ের যোগ্য হল বইকি !

—তাহলেও কিছু দিন দেরি করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মা-র বড্ড ইচ্ছা তিনি থাকতে থাকতেই শুভকাজটা হয়ে যায়।

—খুবই স্বাভাবিক। সবার ছোট নাতনী। ওঁরওতো বয়স হল।

—সেইজন্যেই দিতে হচ্ছে। মেয়েটা পড়াশুনায় খুব ভালো। ভাবছিলাম, স্কুলের টার্মটা অন্তত শেষ হোক, কলেজে ঢুকুক। তারপর বিয়ের কথা চিন্তা করা যাবে।

—তা, আজকাল তো মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গিয়েও পড়াশুনা করে। …ওটা আর তেমন কোনো প্রব্লেম নয়। আসল কথা হচ্ছে—কী খবর?

একটি যুবক ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকেছিল। বলল, বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

—অজ্ঞান হয়ে গেছেন! কপাল কুঞ্চিত করে চিন্তান্বিত মুখে আস্তে আস্তে বললেন বীরেশ্বর। তারপর বন্ধুর দিকে চোখ ফেরালেন।

কিছু বলবার আগেই রঘুনাথ নিজে থেকে বলে উঠলেন, তুমি দেখে এসো। আমি তো আছি।

বীরেশ্বর-পত্নী রঘুনাথের সামনে বেরোন না। মেয়েরা কেউ কাছে নেই। সুপ্রকাশ বাড়ি ছিল না। ছুটির দিন বলে সকালে উঠেই মাইল কয়েক দূরে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সারাদিনের প্রোগ্রাম।। প্রধান উপলক্ষ পুকুরে ছিপ ফেলা। ফিরতে সেই সন্ধ্যা। গৃহিণী ছোটছেলেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়।

—আপনাকে চা দেবো কাকাবাবু?

—এখনই কী? বীরেশ্বর আসুক।

—ওঁর যদি দেরি হয়?

—তখন চেয়ে নেবো। তুমি বসো। তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক। বীরেশ্বর ফিরে এলে চা-খাবার এল। তার সঙ্গে আরেক দফা কথা-বার্তা। বিয়ের ব্যাপাব বিস্তৃত আলোচনা হল দুই বন্ধুতে। রঘুনাথের একটি বিশেষ প্রস্তাব ছিল। সে বিষয়ে মতামত চাইতেই বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, বেশ তো। এতে আর আপত্তি কী?

—বৌঠানের সঙ্গে একটু কথা বলে নেবে?

—কোনো দবকার নেই। অন্য কেউ হলে সে কথা উঠতে পাবত। তোমাব বেলায়—

বাকিটা আর বলবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

সন্ধ্যার দিকে রঘুনাথ যখন 'উঠব উঠব' করছেন সুপ্রকাশ এল। প্রকাশ্যে না বললেও আসলে তিনি তাব জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। রঘুনাথ তাকে দেখেছেন। দূর থেকে দু-এক নজবে। তাও বেশ কিছুদিন আগে। সামনা-সামনি ভালো কবে দেখা, কথাবার্তা বলা —দুটোরই প্রয়োজন ছিল। কিছুক্ষণ বসে গেলেন। ছেলেটিকে ভালোই লাগল। সুদর্শন, নম্র, বিনয়ী। একটু বেশী লাজুক, যাকে মুখচোবা বলা চলে। সেটা হয়তো ওঁর কাছে, বাবাব বন্ধু এবং ওবই লাইনেব একজন নাম-করা সিনিয়র বলে। কিন্তু বয়সটা নন্দাব চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী এবং যেন ভারিক্কি গোছের। একুশ-বাইশ বছবের একটি বোগা পাতলা ছেলে হলেই তাঁর মেয়েব সঙ্গে মানাত ভালো। সে রকম পাত্র তো ছিল, সব দিক দিয়ে উপযুক্ত। কিন্তু তাদের অভিভাবকেরা ঐ আসল ব্যাপারে বাজী হল কই? কেউ কেউ মুখে রাজী ভাব দেখালেও রঘুনাথ তাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। বীরেশ্বর এক কথায় মেনে নিল। তার মেনে নেওয়ার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা চলে।

তাছাড়া নন্দা আজ না হয় ছোট আছে, বরাবর তো থাকবে না। তিনি যে ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন, এখন এই ছেলের সঙ্গে নন্দাকে কতটা মানাবে, কি না-মানাবে সে প্রশ্ন উঠছে না।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল। বন্ধু এবং বিশেষ করে বন্ধু-পত্নী তাঁর অনুরোধ মানেন নি। আহারেব আয়োজনটা একটু ব্যাপক আকার নিয়েছিল। উপরোধের আতিশয্যে রঘুনাথ তাব সবটা এড়াতে পারেন নি। রাত্রে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। এক বাটি দুধ আর গোটা কয়েক সন্দেশ মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলেন। তার আগে গৃহিণীর নীরব কিন্তু অতি উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, ঠিক হয়ে গেল। মোটামুটি কথাবার্তাও সেরে এলাম। কাল সব বলছি। রাতটা একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

অনেক দিন ঘর করছেন এই মানুষটির সঙ্গে কিন্তু এতটা প্রফুল্ল তাঁকে কবে দেখেছেন, তাঁর মুখে এই ধরনের স্নিগ্ধ উক্তি কত কাল আগে শুনেছেন, হেমাঙ্গিনী মনে করতে পারলেন না।

সকাল হতে না হতেই শাশুড়ীকে সুখবরটা দিয়ে এলেন। অ্যাঁ! বলে একগাল হেসে বৃদ্ধা ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললেন, না, আপনি উঠবেন না আপনার শরীরটা তো তেমন ভালো নেই।

—এবার আমি ঠিক ভালো হয়ে যাবো; নাতবৌকে 'জোকার' দিতে বলেছ?

(ও অঞ্চলে উলু দেওয়াকে বলে জোকার দেওয়া)

বলছি, বলে চলে যাচ্ছিলেন হেমাঙ্গিনী। কত্তামা ডেকে ফেরালেন। ক্ষণকাল নীরবে কী ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এ আমি জানতাম বৌমা। রঘু কখনো মা-র কথা ঠেলতে পারে? এই

এতটুকু থেকে দেখে আসছি, মা বলতে অজ্ঞান। ও রকম ছেলে কারো হয় না।…বলতে বলতে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

নন্দা সবে ঘুম থেকে উঠেছে, তখনো দোর খোলে নি। হঠাৎ কয়েক ঝাঁক উলু শুনে চমকে উঠল। তখনই ঘন ঘন ঘা পড়ল কপাটের গায়। বাইরে বড়বৌদির গলা—নন্দা, দরজা খোল। আর কত ঘুমোবে?

কোনোরকমে কাপড়-চোপড় ঠিক করে খিলটা খুলতেই বৌদি তখন ছুটে এসে নন্দাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে খুশীমুখে বলল, কী খাওয়াবে বল?

—কেন, কী হল আবার?

—আহা, মেয়ে যেন আজ কিছুই বুঝতে পারছেন না।! তার মানে সুখবরটা নিজের কানে শোনবার ইচ্ছা। বেশ, তাহলে শোনো, দুকান দিয়ে খুব ভালো করে শোনো।…বাবা কাল সব ঠিক করে এলেন।

নন্দা আগেই বুঝতে পেরেছিল। বৌদির হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে স্তব্ধ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড়বৌ দেখল তার মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে।

ভোর হবার আগেই রঘুনাথ গিয়ে বসেছেন তাঁর চেম্বারে। কাল সমস্ত দিন ছিলেন না। কয়েকটা জরুরী কেস্ আছে। তার জন্যে তৈরি হতে হবে। একটা রয়েছে প্রথম সাবজজের ঘরে। আজ সওয়াল জবাবের দিন। সাধুচরণও ব্যস্ত। বাবু যেমন যেমন চাইছেন নথিপত্র এগিয়ে দিচ্ছে, মোটা মোটা বই পেড়ে দিচ্ছে র‍্যাক থেকে। এরই মধ্যে 'কর্তার' অলক্ষ্যে একজন ঝি এসে জানলার ওপার থেকে ইশারায় জানিয়ে গেছে গৃহিণী একবার দেখা করতে বলেছেন।

একটু ফাঁক বুঝে সাধুচরণ মিনিট কয়েকের জন্যে ঘুরে এল। তলবের হেতু তো তার জানা। 'গিন্নিমা' কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই হাতের আঙুলগুলো উল্‌টে এবং মুখে একটি বিশেষ ভঙ্গি করে জানিয়ে দিল, এবেলা আর কোনো আশা নেই।

হেমাঙ্গিনী মনে মনে হাসলেন। একটা রাত তাকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন, দেখা যাক সেটা ক-রাতে গিয়ে ঠেকে।

অন্য দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা দেরি করে ফিরলেন রঘুনাথ। সঙ্গে চার-পাঁচ জন লোক। তাদের নিয়েই বসে গেলেন। চা-খাবার গেল বৈঠকখানায়। অন্দরে যখন ঢুকলেন রাত্রির খাবারের সময় হয়ে গেছে। স্ত্রীকে বললেন, বেশী কিছু দিও না। এখনই আবার গিয়ে বসতে হবে। অনেক কাজ। কাল সকালে আর কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

সংক্ষিপ্ত আহার শেষ করতে যে সময়টুকু লাগল তার সবটাই জুড়ে রইল ঐ ফেলে আসা 'কাজের' চিন্তা। হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখ দেখেই বুঝলেন, আজ কোনো কথা পাড়বার সময় এটা নয়।.

আলোচনা-পর্ব সন্ধ্যাবেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার ব্রীফ্‌ তৈরির পালা। জটিল মক্কেল ও জুনিয়রদের সঙ্গে মামলা। বই-পত্র যা দরকার আগেই আনিয়ে নিয়ে সাধুচরণকে বিদায় করে দিয়েছেন রঘুনাথ। চেম্বারে এখন তিনি একা। চারিদিকটা নিঝুম হয়ে গেছে। নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন। ভিতর দিকের দরজা খোলা। সেখানে খট করে একটা শব্দ হতে চোখ তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়ল সামনের দেয়ালের বড় ঘড়িটার উপর। সবিস্ময়ে বললেন, একী! তুই এখনো ঘুমোস নি? বারোটা বাজে!

নন্দা কোনো জবাব দিল না। দরজার পাশেই ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে

রইল। রঘুনাথ তাকে কাছে ডাকলেন। নন্দা তাঁর টেবিলের ওপারে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার কাছে এসে বোস। নন্দা তাই করল। চেয়ারটা একটু সরিয়ে বাবার ডান পাশটিতে গিয়ে বসল। তিনি সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বল, কী বলবি।

নন্দা মাথা নোয়াল। মৃদুকণ্ঠে বলল, বাবা, আপনি যে সেদিন বলে-ছিলেন—বলে থামল। রঘুনাথ ঠিক ধরতে পারলেন না।

—কোন্‌দিন ?

—যেদিন ওঁরা আমাকে দেখতে এসেছিলেন ?

—ও, সেই কথা ?···কিন্তু মামণি, তোমার ঠাকুমার অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছ। যদ্দুর মনে হয় বড়জোর আর দু-তিন মাস উনি আমাদের মধ্যে আছেন। হয় তো তাও নয়। একটি মাত্র সাধ তোমার বিয়ে দেখে যাবেন। সেটা যদি অপূর্ণ থেকে যায়, মৃত্যুর পরেও উনি শান্তি পাবেন না। একমাত্র ওঁর কথা ভেবেই ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছে। তবে তোমার ইচ্ছা তো আমি জানি। শুধু তোমার কেন, আমার ইচ্ছাও তাই। তোমার পড়াশুনোর কোনো ব্যাঘাত হবে না। যেমন চলছিল, তেমনি চলবে। বিয়ের পরেও তুমি আমার কাছেই থাকবে, যদ্দিন না পাস-টাস করে বেরোও। ওদের সঙ্গে সে কথা আমি পাকা করে নিয়েছি।

নন্দা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল। এবার তেমনি মাথা নীচু করেই বলল, কিন্তু সে কথা যদি ওঁরা না শোনেন ?

—নিশ্চয়ই শুনবে। বীরেশ্বর আমাকে কথা দিয়েছে। ও, বীরেশ্বরকে তুই চিনিস না। দেখেছিস, হয়তো মনে নেই। এ বাড়িতে এসেছিল। তখন তুই খুব ছোট। আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। লোকে আমাদের

বলত মানিকজোড়। তারপরেও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েগেছে। স্টীল উই আর গ্রেট্ ফ্রেণ্ডস্। তারই ছেলে। চমৎকার দেখতে। তেমনি সুন্দর স্বভাব। আমরা অনেকক্ষণ বসে কথাবার্তা বললাম।...যা, এবার তুই শুতে যা। তোর কোনো ভাবনা নেই।...

বলতে বলতে চোখ ফিরিয়ে যে নথিটা পড়ছিলেন, তারই উপর ঝুঁকে পড়লেন। নন্দা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আর কতক্ষণ বসবেন ? এত রাত হয়ে গ্যাছে।

— কী করবো মা ? চোখ না তুলেই বললেন রঘুনাথ, দিস্ ইজ্ মাই প্রফেশন। টাকা নিয়েছি,...দায়িত্ব নিয়েছি তবে প্রায় শেষ করে এনেছি। আধ ঘন্টার মধ্যেই উঠে পড়বো। তুই যা।

নন্দা অবুঝ মেয়ে নয়। 'ঠাকুমার' দিকটা বুঝল। বাবা যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যেও অনেকখানি আশ্বস্ত হল। বিয়ে হচ্ছে হোক। সে এখানেই থাকবে। পড়া বন্ধ হবে না।

পরদিনই কাছারি থেকে ফিরে মা-র ঘরে বসে রঘুনাথ তাঁর মুন্সীগঞ্জ অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ জানালেন। পারিবারিক আসর। নন্দা ছাড়া সকলেই উপস্থিত। স্ত্রী, বড়ছেলে, বড়বৌ, সাধুচরণ পর্যন্ত। মা জানতে চাইলেন, ছেলে তো তুই নিজেই দেখে এলি। ওরা মেয়ে দেখতে আসছে কবে ?

—আমি বলেছিলাম। বীরেশ্বর বলল, মেয়ে তো আমার দেখা। আবার কী দেখবো ! আমি বললাম, তখন তো সে এতটুকুন। ও বলল, তাতেই হবে। তাছাড়া তোমার মেয়ে !

সবাই তখন খুশী মনে বেরিয়ে গেল। রঘুনাথও উঠলেন। সাধুচরণের দিকে ফিরে বললেন, এদিককার যোগাড়যন্তর তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দিন, ঘোষালকাকা। আশ্বিনের মাঝামাঝি হয়ে এল।

আসছে মাসে তো হবে না। অঘ্রানের প্রথমেই যে দিন পাওয়া যায়—

ঘোষাল মাথা নাড়ল, আমাকে কিছু বলতে হবে না।

অন্য সকলে উঠে গেলে 'কত্তামা' পুত্রবধূকে ডাকলেন। বাইশার মাকেও বাইরে যেতে বললেন। হেমাঙ্গিনী একটু ব্যস্ত হয়েই ঘরে ঢুকলেন। তারপরেই নিশ্চিন্ত হলেন, শাশুড়ীর দন্তহীন মুখে এক-গাল হাসি। —জানো, বৌমা ? রঘু এতবড় উকিল হলে কী হবে ? সংসারী বুদ্ধি ওর কিছু নেই। শর্ত ! আরে, একি তোর ওকালতি পেয়েছিস ? অতবড় মেয়েকে কেউ বিয়ের পর বাপের বাড়ি ফেলে রাখে ? এমন শর্ত কেউ মানে ? যাকগে, বিয়েটা তো হয়ে যাক ! শর্ত ফর্ত তারপর দেখা যাবে।

মেয়ের মা ব্যাপারটাকে অতটা হালকাভাবে নিলেন না। বললেন, আমার কিন্তু এখন থেকেই ভাবনা হচ্ছে। যা মেয়ে, পরে ঐ নিয়ে আবার একটা গণ্ডগোল না বাধায়।

—তুমি ক্ষেপেছ ! বৌমার আশঙ্কাকে এক কথায় উড়িয়ে দিলেন শাশুড়ী, তোমার মেয়ে আর কচি খুকী নেই। ঐ বয়সে আমার বড় মেয়েটা পেটে এসে গ্যাছে। মেয়ে তোমার যত বড় পণ্ডিতই হোক, মেয়ে মানুষ তো। ববের পাশে দু-একবার—ওঁর বড় দুই নাতনী হয়তো উপভোগ করত কিন্তু পরে যা বললেন "বৌমা" একটু মুশকিলে পড়লেন। বৃদ্ধবয়সে মুখের বাঁধন আলগা হয়ে যায়, বিশেষ করে মেয়েদের। তাছাড়া ঐ জাতীয় কথাবার্তায় স্ত্রীজাতি নিজেদের মধ্যে অনেকখানি অবাধ এবং উদার। ইংরেজিতে যাকে free tongue বলে তার ব্যবহারে সম্পর্কের বাছ-বিচার তাদের মধ্যে কম। হেমাঙ্গিনী একটু মুখটিপে হাসলেন। এ নিয়ে প্রকাশ্যে

কিছু বলা যায় না। তবে ভিতরে ভিতরে বোধহয় শাশুড়ীর সঙ্গে একমত হলেন।

শাশুড়ী-বৌ স্থির করলেন, আপাতত এসব কথা তাঁদের দুজনের মধ্যেই রইল। নন্দার কানে যেন কোনো কথা না যায়। সে জানুক, হ্যাঁ, ; বিয়ের পরেও সে আমাদের এখানেই থাকবে, যতদিন ইচ্ছা পড়াশুনো করবে।

নন্দা তখন এর বেশী কিছু জানে নি। তবে তার কানে এসেছিল, এবং সেটা এসেছিল অনেক পরে, যে এই 'শর্ত' নিয়ে ও তরফে একটা তোলপাড় চলেছিল। এ বাড়িতে যেমন রঘুনাথ সর্বময় কর্তা, তিনি যা স্থির করবেন, তাই স্থির, তার উপরে আর কারো কথা নেই, ও বাড়িতে বীরেশ্বর তেমন একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। গৃহিণীর একটা স্থান ছিল। বিশেষ করে ছেলেমেয়ের বিবাহাদি ব্যাপারে তার একটা বক্তব্য ছিল, যেমন মোটামুটি সব সংসারেই সাধারণত থাকে। তিনি কিন্তু স্বামীর বন্ধুর সামনে কখনো বেরোন নি। সেদিনও অন্তরালে ছিলেন। দুই বন্ধুতে কী কথা হল আড়াল থেকেও শোনার সুবিধা ছিল না। বাইরের ঘরটা অন্দর থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। পরে তিনি যখন সব শুনলেন তাঁর প্রথম উক্তি হল, এ আবার কোন্ দেশী কথা? বিয়ের পরে বৌ শ্বশুরঘর করতে আসবে না, বাপের বাড়িতে থেকে যাবে, এ কখনো হয় নাকি? হ্যাঁ, দু-চার মাস না হয় বাপের বাড়ি থাকল। তারপর তাকে আনতে হবে না? বাড়ির বড় বৌ! এরকম কথা তুমি দিতে গেলে কেন?

বীরেশ্বর আমতা আমতা করতে লাগলেন, রঘু বলল, মেয়েটার পড়বার ভীষণ ইচ্ছে। লেখাপড়াতেও খুব ভালো। কয়েকটা বছর

নিজের কাছেই রাখতে চায়। তারপরে তো আসবেই।

—কয়েক বছর! তদ্দিন আমার সংসার চলবে কী করে? আর লেখা-পড়া দিয়ে হবেটা কী? এখানে তো তাকে মাস্টারনীগিরি করতে হবে না। এ সম্বন্ধ তুমি ভেঙে দাও।

—আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। আমার বিশেষ বন্ধু। এখন ভাঙি কী করে?

—বলে পাঠাও, ছেলের এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নয়।

ছেলের প্রসঙ্গ উঠতে কথাবার্তার ধারা অন্যদিকে মোড় নিল। বীরেশ্বর বললেন, আসলে ওর কথা মনে রেখেই আমি রঘুর প্রস্তাবে রাজী হয়েছি। কত বড় উকিল জানতো? ঢাকার মতো অতবড় 'বার'-এ প্রথম তিন-চার জনের মধ্যে রঘু বাঁড়ুজ্যের নাম। দেওয়ানী ফৌজদারী দুটোতেই সমান হাত। বড়খোকা তো এদিকে বিশেষ কিছুই করতে পারছে না। কোনোরকমে টিম্ টিম্ করে চলেছে। আমি কথা দেবার আগে রঘুই আমাকে কথা দিয়েছে ওকে সে দাঁড় করিয়ে দেবে। এই মুন্সীগঞ্জ এলাকা থেকেও অনেক কেস্ যায় তার কাছে। রঘু বলেছে, 'আসছে মাস কি তার পর থেকেই তার কিছু কিছু আমি সুপ্রকাশকে পাইয়ে দেবো। এদিকে আমার জানাশুনো যে-সব পার্টি আছে তাদেরও বলে দেবো। তাদের অনেক মামলা থাকে লোক্যাল কোর্টে। সেগুলো ও পাবে। সব মিলিয়ে মোটামুটি মন্দ হবে না। তারপর কিছুদিন যাক। হাতটা একটু পাকুক তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। আমি তো রইলাম।' এরকম সুবিধে কোথায় পাওয়া যেত বলো? আমি কি খালি খালি রাজী হয়েছি?

ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে গৃহিণীও আর তেমন আপত্তি করলেন

না। মনটা অবশ্য খুঁত খুঁত করতে লাগল। ছেলের বয়স হচ্ছে। তার বিয়েবিয়ে করে অনেক দিন থেকেই খোঁচাচ্ছিলেন 'কত্তাকে'। একটি বেশ বড়সড় বৌ চাই, এসেই যে সংসারের অনেকখানি ভার তুলে নিতে পারে। তিনি একা আর কত করবেন ? তাঁরও তো বয়স কম হল না। কিন্তু এ কী হল !

সুপ্রকাশ নিজেও খুশী হয় নি। ভাবী শ্বশুরের প্রস্তাব সে তার সম্মানের পক্ষে হানিকর বলে মনে করেছিল। বিয়ে হবে, অথচ বৌ তার কাছে আসবে না, এটা যে কোনো পুরুষের পৌরুষে বাধে। সোজা 'না' বলে দিত। কিন্তু বাল্যবন্ধুর কাছে বাবা বড় খেলো হয়ে যাবেন, এই ভেবে আর ওদিকে এগোয় নি। তাছাড়া তার ব্যবসায়গত সুবিধার যে স্পষ্ট আশ্বাস দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, তাকেও উপেক্ষা করা চলে না। তারপরেও যেটুকু দ্বিধা ছিল, সেটা এককথায় দূর করে দিল তার সেই পরিহাসরসিকা জ্যেঠতুতো বৌদিদি। একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, মাত ঘাবড়াও ! ঐ রকম লেকচার আজকাল অনেক মেয়ে দিয়ে থাকে—'বৌ তো আর দাসী নয় যে তাকে বরের হুকুম মেনে চলতে হবে। বিয়ের পরদিন থেকেই হেঁশেলে গিয়ে ঢুকতে হবে। তারও একটা স্বাধীন মতামত আছে! তার পড়াশুনো আছে, গানবাজনা আছে, হ্যানো আছে, ত্যানো আছে ! আরো কত কী বলে! কিন্তু এ সব বড় বড় কথার দৌড় কদ্দুর জানে ?"

বাসরঘর পর্যন্ত। ব্যস, ঐ একটা রাতের পরেই সাপের মাথায় ধুলো। পড়া-ফড়া সব শিকেয় ওঠে। তখন একেবারে উলটো সুর—মুখে না বললেও মনে মনে—কবে যে নিয়ে যাবে ! বাপের বাড়িতে কেউ একনাগাড়ে বেশী দিন পড়ে থাকে নাকি ? লোকে

কী বলবে !

বীরেশ্বর মুখুজ্যের গোটা পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এমনি এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে নন্দার কানে এ সব তথ্য পৌঁছেছিল। তখন জল অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে আরো শুনেছিল বৌকে প্রথম থেকেই বশে আনার পন্থা হিসেবে 'জ্যেঠতুতো বৌদিদি' দেওরকে নাকি আরো কিছু গোপন পরামর্শ দিয়েছিল। সেটা প্রকাশ পায় নি।

৪

বিয়ের লগ্ন ছিল মাঝরাত্রে। রঘুনাথের ইচ্ছা কন্যাসম্প্রদানের পবিত্র দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করবেন। নন্দা তাঁর শেষ এবং প্রিয়তম সন্তান। কিন্তু অন্যান্য দিকেও তাঁর কাজের অন্ত নেই।

এটাই এ বাড়ির শেষ উৎসব। সুতরাং আয়োজনের বহরটা স্বভাবতই বিরাট আকার নিয়েছিল। গৃহকর্তা কারো কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি। দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা বেশ ক'দিন আগে থেকে আসতে শুরু করেছেন। পুরুষদের হাঁকডাকে মেয়েদের কলকণ্ঠে ছোটদের কোলাহলে অতবড় বাড়ি সরগরম। তাদের আদর-আপ্যায়ন আহার-বিহারের ব্যবস্থা, তার উপর কেনাকাটা, জিনিস-পত্র আনা নেওয়া এবং অন্যান্য অসংখ্য ছোট-

বড় কাজ, সবটাই বলতে গেলে একজনের ঘাড়ে।

ঘোষাল অবশ্য আছে। ছেলেরাও খাটছে খুব। কিন্তু আদেশ নির্দেশ আসছে সব ঐ এক জায়গা থেকে।

কর্তৃত্ব এমন একটি জিনিস যা একবাব কাঁধে তুলে নিলে ইচ্ছা করলেও আর নামানো যায় না। রঘুনাথের নিশ্বাস ফেলাব অবসর ছিল না। তাব উপরে সম্প্রদান মানে প্রায় নির্জলা উপবাস। বয়স হয়েছে। মা বলেছিলেন, ওটা বিশু করুক। বাবা আর কাকার তফাত কী?

বিশু অথাৎ বিশ্বনাথ, রঘুনাথের ছোটভাই। থাকেন কাশীতে। বিয়ে-থা করেন নি। সাত্ত্বিক মানুষ। ধর্মচর্চা নিয়ে আছেন। সেদিক দিয়েও উপযুক্ত ব্যক্তি।

কিন্তু রঘুনাথ বললেন, না মা, আমিই করবো। বিশু বরং পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে বসে যোগাড়-যন্তরগুলো করে দিক।

বর-কনেবও উপোস থাকা নিয়ম। মেজবৌ সকলের অলক্ষ্যে নন্দাকে একটু দুধ আর দুটো মিষ্টি অনেক বলে-কয়ে খাইয়ে দিয়েছিল।

বিয়ে একটি ব্যাপক অনুষ্ঠান। ভোরবেলা দধিমঙ্গল থেকে শুরু করে সারাদিন এবং প্রায় সাবারাতব্যাপী অজস্র ক্রিয়া-কর্মে ভর্তি।

সকালবেলায় নান্দীমুখ। সেটা রঘুনাথেব করণীয়। স্বর্গত পিতৃ-পুরুষদের তৃপ্ত করে তাঁদের অলক্ষ্য.আশীর্বাদ নিয়ে তারপর শুভ-কর্মের সূচনা।

রাত্রে বিয়ের আসরে সম্প্রদান ছাড়াও অনেক খুঁটিনাটি আছে। সবটাই শাস্ত্রোক্ত নয়, তার মধ্যে কিছু লোকাচার। সব মিলিয়ে

গোটা ব্যাপারটা বেশ দীর্ঘস্থায়ী। তার বাইরে খানিকটা স্ত্রী-আচার সেরে নিতে হয়। ওটা পুরোপুরি মহিলাদের এলাকা। ঘন ঘন উলুধ্বনি (যাতে ছোট-বড় সব মেয়েই রীতিমতো দক্ষ) হৈ চৈ হাসি কলরব উচ্ছ্বসিত উল্লাস।

এই আনন্দের.উৎপাত, শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় উৎপীড়ন কনে বেচারাকে নীরবে সয়ে যেতে হয়। ঘোমটা ঘেরা মুখ এবং দামী বেনারসী জড়ানো উপবাসক্লিষ্ট শরীরের দিকে কেউ তাকায় না। অত রাত্রে লগ্ন। খাওয়া দাওয়ার পাঠ আগেই সেরে নিতে হবে। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বরযাত্রীর দলও সন্ধ্যার কিছু পরে ভূরিভোজে আপ্যায়িত হয়ে সরে পড়ল। কিছু রয়ে গেল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং সুপ্রকাশের দু'চারজন বন্ধু। আর রইলেন বরকর্তা। সকালবেলা বর-কনে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ আর কত দূর? কুশণ্ডিকা সেখানে গিয়ে হবে। ওটা বরপক্ষের করণীয়। দূর পথ হলে ঐ অনুষ্ঠানটি—বিয়ের চেয়ে কম ব্যাপক নয়—কনের বাড়িতেই সারতে হয়। যাবতীয় খরচ পাত্রপক্ষের।

এতক্ষণ একটানা বলে যাচ্ছিলেন স্মরজিৎ। এইখানে এসে একবার থামলেন। সিগারেট ধরিয়ে মিনিট খানেক ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে বললেন, কুশণ্ডিকা কী জান তো? তুমি নিজে তো আর বিয়ের পিঁড়িতে বসলে না।

—নিজে না বসলেও অন্তত ডজন খানেক বন্ধুকে তো বসতে দেখেছি। কুশণ্ডিকাও দেখেছি। অনেকক্ষণ ধরে কি সব হোমটোম হয়। বামুনদের মধ্যেই বোধহয় ওর চোটটা কিছু বেশী। তাই না?

—হ্যাঁ, ঐটাই হল বিয়ের প্রধান অঙ্গ। বিশেষ করে, তুমি যা বললে, ব্রাহ্মণদের বেলায় অনেকক্ষণ ধরে চলে। হোম, যজ্ঞ, সপ্তপদী—

—সপ্তপদী ব্যাপারটা যেন আগের রাতেই হয়ে যায় মনে হচ্ছে। সাতপাক ঘোরা তো ?

স্মরজিৎ হেসে বললেন, না হে, সপ্তপদী মনে সাতপাক ঘোরা নয়, বর ও কনের একসঙ্গে সপ্তপদ গমন। বরের পেছনে গাঁটছড়া বাঁধা কনে গুনে গুনে সাত পা এগিয়ে যাবে।

দৃশ্যটা মৃগাঙ্কর মনে পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, ও হ্যাঁ দেখেছি। ওটাও বোধহয় একটা ইম্পর্ট্যান্ট আইটেম।

—শুধু ইম্পর্ট্যান্ট্ নয়, এসেনশিয়াল। তাছাড়া ঐ কুশণ্ডিকার শেষেই বর নিজের হাতে কনের সিঁথিতে সিন্দূর পরিয়ে দেয়। তাকে সিমন্তিনী, অর্থাৎ বধূ বলে গ্রহণ করে। এতক্ষণ এত কাণ্ডের পরেও যারা ছিল শুধু বর-কনে ঐ সিন্দূর-রেখাটি টানা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পরস্পরের কাছে ও সমাজের সামনে স্বামী স্ত্রী বলে স্বীকৃত হল। এটাকে বলতে পার বিয়ের আসল এবং ফাইন্যাল স্টেজ। ···যাক, এবার শোনো।

স্মরজিৎ আবার সেই বিয়ের রাতে ফিরে গেলেন।

বর-কনেকে বাসরঘরে পৌঁছে দিয়ে মেয়ের দল বেরিয়ে এল।

রাত প্রায় শেষ। এখনই কাক ডেকে উঠবে। অঘ্রান মাসের শেষ। বেশ শীত পড়ে গেছে। আড়ি পাতার মতো উৎসাহ বড় একটা কারো ছিল না। সারারাত জেগে কোথাও গিয়ে লেপের তলায় আশ্রয় নেবার প্রয়োজনটাই বেশী বোধ করছিল।

আড়ি পেতে শুনবেই বা কী ? ঐ তো কনে! বিয়ের পিঁড়িতেই

বারবার ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। দুদিক থেকে দুটি মেয়ে ধরে বসে ছিল। তা না হলে ওখানেই শুয়ে পড়ত। খাটে উঠতে না উঠতেই যে ভাবে জড়-সড় হয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে, এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। আহা বেচারা! ছেলেমানুষ, তায় সারাদিনের এতবড় ধকল। ঘুমোক।

সকলেই চলে গেল এবং যে যেখানে পারে সটান হল। দুটি মেয়ে রয়ে গেল। তাদের বয়স কম। কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। নিজেদের জীবনে এই রাতটির স্মৃতি এখনো অম্লান। কৌতূহল এখনো প্রবল। এই সুযোগে দুটোকেই হয়তো একটু ঝালিয়ে নিতে চায়। রাত জাগা তাদের অভ্যাস আছে। তারা গিয়ে দাঁড়াল একটা জানালার ধারে।

ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। দেখবার কোনো উপায় নেই। কপাটের ফাঁকে কান রাখল যদি কিছু শোনা যায়।

হঠাৎ কানে গেল কনে বেশ জোরে জোরে বলছে, 'না'। এক-বার নয়, কয়েকবার।

একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হাসল মেয়ে দুটি। বরও কি সব বলছিল। এত আস্তে যে শুনতে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পরে আবার কনের গলা—'ছেড়ে দিন।' আরো মজা পেল মেয়ে দুটি এবং পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু ভিতরে আর কোনো শব্দ নেই।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে 'দূর,! চল, শুয়ে পড়িগে', বলে সরে গেল।

এঘর-ওঘর ঘুরে কোথাও একটা জায়গা সংগ্রহ করে শুয়েও পড়েছিল মেয়েদুটি। ঘুম আসছিল না। যা দেখতে পেল না, শুনতে

পেল না, কিন্তু নিজেরা যার স্বাদ পেয়েছে তারই ছবি হয়তো তাদের স্নায়ুদেশে কিঞ্চিৎ উত্তাপ সঞ্চার করে থাকবে।

একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে তুজনেই ধড়মড় করে উঠে বসল। কোনো তীব্র আঘাত পেলে লোকে যেমন চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, অনেকটা সেই রকম। শব্দটা বাসরঘরের দিক থেকে আসছে বলে মনে হয়েছিল। সেখানেই ছুটে গেল।

এঘরে ওঘরে আরো কারো কারো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারাও উঠে এসেছে। বুঝতে পাচ্ছে না, কোত্থেকে কে চেঁচাল। ঐ মেয়ে-তুটিকে দেখে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার সকলেই শুনতে পেল ঘরের ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। দরজায় ধাক্কা দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় কপাট খুলে গেল এবং আলুথালু বেশে বেরিয়ে এল কনে। ভালো করে চলতে পারছে না। মেয়েরা কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল. এবং আস্তে আস্তে নিয়ে চলল তার মায়ের ঘরের দিকে।

তিনি আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন। নন্দা গিয়ে আছড়ে পড়ল তাঁর বুকের উপর। তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রাত আর নেই। পূবদিক ফর্সা হয়ে গেছে। বিয়েবাড়ির অত লোক। প্রায় সবাই উঠে পড়েছে। মা-মেয়েকে ঘিরে রীতিমতো ভিড়। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। মেয়ে-পুরুষ সবাই ছবির মতো দাঁড়িয়ে।

ভিড়টা হঠাৎ নড়ে উঠল। তুধারে সরে গিয়ে খানিকটা পথ করে দিতে তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলেন রঘুনাথ। কার কাছ থেকে কী খবর পেয়েছেন তিনিই জানেন। তবে কেউ তাঁকে ডাকে নি।

স্ত্রীকে উদ্দেশ করে গম্ভীরভাবে বললেন, ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও। চারদিকে একবার চোখ ফেলে একটু বিরক্তির স্বরে বললেন, তোমরা এখানে কী করছ ?

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

বাবার গলা শুনে নন্দার কান্নাটা আবার উছলে উঠেছিল। হয়তো লজ্জায় অপমানে অভিমানে মায়ের বুক থেকে মাথা তুলল না। চোখ তুলে তাকাল না ; কিছু বলল না। তিনিও কিছু জানতে চাইলেন না। মেয়ের দিকে এক পলক দেখে নিয়েই ফিরে চলে গেলেন।

"আর ওদিকে জামাতা বাবাজী নির্বিঘ্নে ও আরামে ঘুমোতে লাগলেন !" শ্লেষ-তিক্ত স্বরে বলে উঠল মৃগাঙ্ক।

স্মরজিৎ একটু হাসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, লেখক মানুষ বলে তোমার একটু শক লেগেছে, বুঝতে পারছি। লাগবারই কথা। তোমরা বলবে, আমার মতো নয়, আরো অনেক সুন্দর করে বলবে, বিয়ের পরে স্বামীর প্রথম কাজ হল নববধূর মন জয় করা, তার সুপ্ত বাসনাকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা। বলবে, তার মনটা ফুলের কুঁড়ির মতো। কুঁড়িকে যেমন জোর করে ফোটানো যায় না, আলো-হাওয়ার মৃদু স্পর্শে যখন সময় হয় সে আপনিই তার পাপড়িগুলো মেলে ধরে, তেমনি একটি কিশোরী মেয়ের মনের দলগুলোও খোলাতে হবে ভালোবাসার স্পর্শ দিয়ে। তার জন্যে সময় চাই, চাই অনুকূল পরিবেশ। দেহকে পেতে হলে তার মনকে আগে বশ করা চাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অঙ্কের মাস্টার হলে কী হয়। আমিও তোমাদের মতো এক-আধটু কবিত্ব করতে পারি।

মৃগাঙ্ক বলল, আমাদের চেয়ে অনেক ভালোই পারেন দেখছি। কিন্তু যা বললেন সবটাই কি নিছক কবিত্ব? এর মধ্যে কোনো সত্য নেই?

—নিশ্চয়ই আছে। এই রকমই হওয়া উচিত, এইটাই ঠিক পথ, সে কথা অবশ্যই স্বীকার করবো। কিন্তু ব্রাদার, সংসারে, 'ঠিক' আর 'উচিত' ক'টা ক্ষেত্রে ঘটতে দেখেছ? এখানেও, সচরাচর যা হয়ে থাকে ঐ জামাতা বাবাজী সেই পথ অনুসরণ করেছেন। ওর মতো অনেক বাবাজীই মনে করেন ওটা হচ্ছে, কী বলবো, স্বামী হবার মৌলিক অধিকার, ফাণ্ডামেন্টাল রাইট অফ এ হাজব্যাণ্ড; বিয়ের রাত থেকেই সে রাইট এনফোর্স করতে শুরু করেন। অন্য পক্ষের রি-অ্যাকশন কী হবে, সে বেচারা এর জন্যে তৈরি কিনা, সে সব আর ভাবেন না।

একজন মহিলা ডাক্তারের মুখে শুনেছি, তার কাছে অনেক মেয়ে কবুল করেছে, বিয়ের রাতেই তাদের চরম অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, এবং সেটা শুধু শকিং নয়, রীতিমত পেইনফুল। তার মধ্যে বেশির ভাগ কনের বয়স ষোল-সতেরোর কম নয়, অর্থাৎ ফিজিক্যাল ফিট্‌নেস-এর অভাব ছিল না। এ মেয়েটা তাও নয়! পনর বছরে যতটা ডেভেলপমেন্ট হবার কথা, ওর তা হয় নি। মনের দিক থেকে তৈরি হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিয়েতে সে আগাগোড়া জোরালো অনিচ্ছা জানিয়ে এসেছে।

"রাজী হয়েছিল শুধু ঠাকুরমার ইচ্ছায় আর বাবার কথায়" যোগ করল মৃগাঙ্ক।

—ঠিক তাই।

—যাক, তারপর কী হল বলুন।

স্মরজিৎ আবার শুরু করলেন।

সকাল হল। সারা বাড়িময় একটা থমথমে ভাব। বিয়ে বাড়ির কোনো লক্ষণ নেই। হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, কিছু না। সদরে অন্দরে এত মানুষ! সবাই যেন স্তব্ধ হয়েগেছে। সকলের লক্ষ্য ঐ একজন মানুষ—বাড়ির কর্তা। কারো কারো মনে একটা চাপা আশঙ্কা, কী জানি কি করে বসেন! ঐ রকম একরোখা লোক।

কেউ কেউ আবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, কী আর করবেন? মেয়ের বাপ তো। হাত-পা বাঁধা। যা কিছুই ঘটুক, মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে চুপ করে যাওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে?

এদিকে রঘুনাথ নীরব। সেই যে ভিতর থেকে চলে এসে তাঁর চেম্বারে গিয়ে ঢুকেছিলেন, সেখান থেকে আর বেরোন নি। ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটানা গড়গড়া টেনে চলেছেন। ঘরে আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে ওঁর খাস চাকর বসন্ত গিয়ে কল্‌কেটা পাল্টে দিচ্ছে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বাসী-বিয়ের আয়োজন করা এখনই দরকার। তারপর কুশণ্ডিকা আছে। সেটা হবে সেই মুন্সীগঞ্জে। তার জন্যে আরো সকাল সকাল বর-কনে নিয়ে ওঁদের রওনা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

হেমাঙ্গিনী বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, ওঁকে গিয়ে বল। এখন অমন চুপ করে বসে থাকলে চলবে কেন?

"আমার দ্বারা হবে না মা" সোজা বলে দিল উমানাথ, "রমাকে বল।"

রমানাথ সকালেই বাজারে বেরিয়ে গেছে। তাকে বললে সে-ও

সম্ভবতঃ ঐ একই উত্তর দিত।

বড়ছেলের কথায় মা রেগে উঠলেন, তুই যাবি না, রমা বাড়ি নেই, তাহলে কি আমি গিয়ে কাছারি বাড়িতে উঠবো? এত লোকের সামনে?

—কেন, ঘোষাল দাদুকে বল না?

—তিনি তো সেই রাত থাকতে মাছ আনতে চলে গেছেন।

—মাছ অনেকক্ষণ এসে গ্যাছে! তিনিও ফিরেছেন নিশ্চয়ই।

কথাটার মধ্যে খানিকটা অত্যুক্তি ছিল। 'অনেকক্ষণ' নয়, মাছ নিয়ে ঘোষাল ফিরে এসেছে সামান্য কিছু আগে। রান্নার ওদিকটার ভার যার হাতে তার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে হেমাঙ্গিনীর খোঁজ করতে করতে তাঁর ঘরের সামনে এসে খুশির স্বরে বলল, খুব ভালো মাছ পেয়েছি বৌমা। রূপচাঁদ জেলেকে আগেই—

—মাছ পরে হবে। আপনি শুনুন।

বলে, সাধুচরণকে একান্তে ডেকে নিয়ে এদিকের পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তার একটা মোটা-মুটি বর্ণনা দিলেন। ঘোষালের মুখ গম্ভীর হল।

আমি এখনি যাচ্ছি, বলে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

চেম্বারে ঢুকতেই রঘুনাথ মুখ থেকে নল সরিয়ে বললেন, আপনি ফিরেছেন? এক কাজ করুন। বরপক্ষের ক'জন রয়ে গেছে, দেখে নিয়ে সেই মতো গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন।

ঘোষাল মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। লক্ষ্য করে রঘুনাথ আবার মুখ তুললেন— কিছু বলবেন?

—বলছিলাম যে অনেক বেলা হয়ে গ্যাছে। এখন গিয়ে ওদিকে সব ব্যবস্থা করা—ব্যাপারটা তো কম নয়। তার চেয়ে কুশণ্ডিকা

এখানেই হোক। আধঘণ্টার মধ্যেই আমি সব আয়োজন করে দিচ্ছি।

রঘুনাথ গম্ভীর শান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, কুশণ্ডিকা হবে না।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধহয় সাধুচরণ এমন করে শিউরে উঠত না। কী একটা যেন বলতে গেল। পারল না। মনে হল তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেছে।

রঘুনাথ তেমনি ধীরভাবেই বললেন, যান, আর দেরি করবেন না। ওদের রওনা করে দিন।

রঘুনাথ যখন ছোট ছিলেন সাধুচরণ তাঁকে বড় খোকা বলে ডাকত। উকিল হয়ে কোর্টে বেরোবার পরেও কিছু দিন তাই চালিয়েছিল। তারপর মক্কেলদের সামনে তাঁকে 'ছোটবাবু' বলে উল্লেখ করত। মনিবকে বলত 'বাবু'। মুহুরীরা তাঁদের উকিলদের বাবু বলে থাকে। মনিবের মৃত্যুর পর রঘুনাথ যখন এস্টেটের মালিক হয়ে বসলেন, তখন থেকে 'ছোটবাবু' 'বাবু'-তে রূপান্তরিত হল।

এইখানে দাঁড়িয়ে নিমেষে সাধুচরণ ঘোষাল যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে গেল, যখন তার স্থান ছিল গৃহকর্তার ঠিক পরেই এবং রঘুনাথ তাকে অভিভাবক বলে মান্য করত। সেইখানে নিয়ে দাঁড় করাল নিজেকে। তীক্ষ্ণ তিরস্কারের সুরে বলল, এসব তুমি কী বলছ বড়খোকা। কুশণ্ডিকা ছাড়া বিয়ে হয়?

রঘুনাথ একটু চমকিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন, আমি তো বলছি না, হয়। এ বিয়ে হবে না।

"এ বিয়ে হবে না!" অতিমাত্র বিস্ময়ে ঐ কথা ক'টাই শুধু আউড়ে গেল সাধুচরণ।

—না।

এবার সুর নরম করল ঘোষাল—মেয়েটার কী হবে ভেবে দেখেছ?

—দেখেছি। যা-ই হোক, ওর অদৃষ্টে যা-ই থাক, তবু ঐরকম একটা—

যে কঠোর শব্দটা তাঁর জিহ্বাগ্রে এসে গিয়েছিল তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন রঘুনাথ। তীব্র ঘৃণায় সারা মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, যান, আপনাকে যা বলেছি তাই করুন।

এ সুর আদেশের। ঘোষাল তা ভালো করেই জানে এবং এও জানে এর পরে আর কোনো কথা চলে না। একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

খবরটা বোধহয় বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষিপ্রবেগে সারা বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ল। হেমাঙ্গিনীও শুনলেন এবং ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। ছেলেরা, বৌয়েরা কী করবে, কাকে কী বলবে ভেবে পেল না। একবাড়ি আত্মীয়-স্বজন সবাই বিহ্বল, বিমূঢ়। এ অবস্থায় এখানে থাকাও অস্বস্তিকর, চলে যাওয়াও দৃষ্টিকটু।

রঘুনাথ দেখা করলেন বর-কর্তা এবং তাঁর বাল্যবন্ধু বীরেশ্বরের সঙ্গে। তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আমরা যা চেয়েছিলাম, দেখা গেল, সেটা ভগবানের ইচ্ছা নয়।

বীরেশ্বর কোনো সাড়া দিলেন না। গম্ভীরভাবে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ছেলে এবং তার বন্ধুরা আগেই উঠে পড়েছিল।

কাল রাত্রেও যে বাড়ি ছিল উৎসব-মুখর আনন্দোজ্জ্বল, কয়েক ঘণ্টা না যেতেই সেখানে নেমে এল স্তব্ধ শোকের ছায়া। বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বিশেষ করে একজনের জীবনে।

সে তখনো তার মায়ের বিছানায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

ক'দিন থেকে 'কত্তামার' অবস্থা বেশ কিছুটা সংকটের ভিতর দিয়ে চলছিল। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদিকের সব খবর নিচ্ছিলেন। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ জ্ঞান ছিল। বাইশার মা সব সময়ে আছে তাঁর কাছে। বৌয়েরা, মেয়েরা ঘন ঘন দেখে যাচ্ছে। রঘুনাথও সুযোগ পেলেই খবর নিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্প্রদানে বসবার আগে মায়ের অনুমতি নিতে এলেন। বৃদ্ধার চোখে জল এসে গেল। বললেন, শেষ পর্যন্ত সবই হল বাবা। আমি পড়ে রইলাম। কিছুই দেখতে পারলাম না।

—কী করবে মা? শরীরের ওপর তো কোনো কথা নেই। বিয়ের পর বাসরে যাবার আগে ওরা জোড়ে এসে তোমাকে প্রণাম করে যাবে। আশীর্বাদ কর, শুভকাজ যেন নির্বিঘ্নে মিটে যায়। তোমার বড় আদরের নন্দা যেন সুখী হতে পারে।

কত্তামা চোখ বুজে বুকের উপর হাত রেখে জপ করতে লাগলেন। শুধু রোজকার জপের মন্ত্র নয়। সবাই বুঝল আসন্ন বিদায়ের পূর্বক্ষণে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে তিনি তাঁর দুটি পরম স্নেহের পাত্র, কিছুক্ষণের মধ্যেই যারা দাম্পত্য বন্ধনে মিলিত হতে চলেছে, তাদেব উদ্দেশে তাঁর শেষ আশীর্বাণী উচ্চারণ করছেন।

একটু পরেই আবার তাঁর চেতনা আছন্ন হয়ে পড়ল। সারারাত সেই ভাবেই গেল। পর দিন বেশ কিছুটা বেলা হলে ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। ঘোর কেটে গেলে এদিক-ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল হয়ে গেছে?

'বাইশার মা ঝুঁকে পড়ে বলল, হ্যাঁ কত্তামা। প্রায় দশটা

বাজে।

—দশটা বাজে! বাসী বিয়ের কী হল?

উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হলেন। যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বললেন, বৌমাকে ডেকে দে।

হেমাঙ্গিনী শুয়ে ছিলেন। শাশুড়ী ডাকছেন শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। কী বলবেন গিয়ে? কথাটা বড়বৌয়ের কানেও গিয়েছিল। সে ছুটতে ছুটতে এল। সাবধান করে দিল শাশুড়ীকে, ঠাকুমাকে এসব কিছু বলবেন না।

—কিন্তু উনি তো জানতে চাইবেন। কী বলবো?

—বলবেন, সব ঠিক মতো হয়ে গেছে।

—গুরুজনের সামনে এত বড় মিথ্যা কেমন করে বলি? ও আমি পারবো না মা।···বলতে বলতে দুচোখ জলে ভরে গেল। বড়বৌ বলল, তাহলে আপনি থাকুন আমি যাচ্ছি।

ততক্ষণে বৃদ্ধার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে। একটি একটি করে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল বড়বৌ—"কাল রাত্রে বর-কনে এসেছিল আপনাকে প্রণাম করতে। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন বলে আর ডাকি নি। বাসী বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা রওনা হয়ে গেছে। কুশণ্ডিকা ওখানে হবে কিনা। কাল তো বৌভাত। পরশু থেকে তার পর দিন ওরা জোড়ে আসবে। না; বরযাত্রীদের আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়ার কোনো ত্রুটি হয় নি। মা একটু শুয়ে আছেন। বড্ড খাটাখাটনি গেল তো। একটু পরেই আসছেন।"

বৃদ্ধার রক্তহীন মুখে একটা তৃপ্তির আভা ফুটে উঠল।

৫

দিন চলল। সংসাবেব চাকাও থেমে রইল না। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাব গতি কয়েকদিনের জন্য হয়তো একটু শ্লথ হয়েছিল। আবাব তাব বেগ ফিরে এল। তার চিরাভ্যস্ত ব্যস্ততাব ভিতর দিযে এগিয়ে চলল বাঁড়ুজ্যে বাড়ি।

মায়েব মৃত্যুর পব অশৌচান্ত পর্যন্ত রঘুনাথ কোর্টে যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। কাজ বন্ধ করেন নি। সকালে বিকালে যথাবীতি সেরেস্তায় গিয়ে বসেছেন। মক্কেলের ভিড় সামলেছেন। শ্রাদ্ধাদি মিটে যাবার পব কোর্টের কাজও পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে।

নন্দা প্রথমটা খুব মুষড়ে পড়েছিল। কিছুদিন প্রায় সব সময়ের জন্যে পড়ার ঘরে দরজা একেবারে বন্ধ করে থাকত। তারপর উঠে

দাঁড়িয়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছে তাঁর জীবনের ঐ রাতটাকে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আগে যেমন চলছিল তেমনি চলতে হবে। একদিক দিয়ে এ বরং ভালোই হল। পড়া-শুনার পথে আর কোনো বাধা বিঘ্ন রইল না। সে বড় হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নিজের জীবনের পথ আবার নিজেই ঠিক করবে।

কিন্তু প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই বুঝতে পারল ঐ একটা রাত তার চারদিকে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। যে জায়গাটি সে রেখে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মেয়েরা সবাই তাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে। অন্তরঙ্গ বন্ধু যারা, তারা তাকে এড়িয়ে যেতে চায়, হাসে না. কথা বলে না। তাকে দেখলেই মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ে, অব্যক্ত সমবেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে —আহা বেচারা।

একটা দল, যাদের সঙ্গে তার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, বরং ভালো ছাত্রী ও বড় লোকের মেয়ে বলে কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত, তাদের মধ্যে তাকে লক্ষ্য করে একটা চাপাহাসি কানাকানি ও গা-টেপাটিপির ধুম পড়ে যায়। নন্দার চোখে পড়ে, কিন্তু যেন কিছুই দেখতে পায় নি, এমন ভাবে সরে যায়।

ক্রমশঃ তাদের মধ্যে কয়েকজন কাছে এগিয়ে এল এবং সরব হল।

একটি মেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, এই, কী হয়েছিল রে তোর বাসরঘরে? অমন করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলি কেন? বল না? আমাদেরও বিয়ে হবে। জেনে রাখি।

নন্দা যখন কোনো জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছিল, খিল খিল করে

হেসে পুটিয়ে পড়ল মেয়েগুলো।

আরেক দিন একটি বিবাহিতা মেয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ নন্দা। বাসর ঘরে সব বরগুলোই অমন ধারা অসভ্যতা করে। আমাদের কী হয়েছিল ?

আরেকজন—তার চেহারা এবং ধরন-ধারণ একটু বীরাঙ্গনা গোছের—মন্তব্য করল, তুই একটা বোকা। ভেউ ভেউ করে না কেঁদে টেনে একটা চড় মারতে পারলি না ?

—তুই বুঝি তাই মারবি ? টিপ্পনি কাটল কে একজন।

—বাড়াবাড়ি করলে নিশ্চয়ই মারবো।

নন্দা আগাগোড়া নীরব। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। এ সব প্রশ্ন বা উপদেশ হয়তো তবু শ্লীলতার সীমা ততটা লঙ্ঘন করে নি। কিন্তু দু-এক জন এমন সব কথা বলতে শুরু করল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন সব প্রশ্ন, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

তাও হয়তো সয়ে যেত। না সয়ে উপায় কী ? আশা ছিল, এরা একদিন নিজে থেকেই থেমে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা যেদিন ছাত্রী-মহল ছাড়িয়ে শিক্ষিকা-মহলে গিয়ে পৌছল, কোনো কোনো দিদিমণি তার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং সে কৌতূহল মেটাবার জন্যে ওর ডাক পড়ল টীচার্স রুমে, তখন আর তার পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হল না।

ইতিমধ্যে তার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে পড়েছিল। দুজন দিদিমণির মুখের উপর কতগুলো কড়া কথা ছুঁড়ে দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এল নন্দা।

একটা ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও বাড়ি পৌছে দেবার। পরদিন যখন কোচোয়ান এল,

নন্দা খবর পাঠিয়ে দিল, সে স্কুলে যাবে না এবং তার সঙ্গে যোগ করল, পরেও তার আর গাড়ির দরকার নেই।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বাবার ঘরে তার ডাক পড়ল। রঘুনাথ জানতে চাইলেন গাড়ি বারণ করে দিয়েছিস কেন?

—ও স্কুলে আর যাব না।

—কেন, কী হয়েছে

নন্দা চুপ করে রইল। রঘুনাথ আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। সব কিছু না জানলেও মোটামুটি বুঝতে পারলেন। শুধু স্কুলে বা পাড়ায় নয়, বাড়িতেও নন্দা এমন একটা পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে বেশি দিন সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা সম্ভব নয়।

যা ঘটে গেল তা নিয়ে অবশ্য কেউ তাকে কিছু বলছে না। কারো ব্যবহারেও অভিযোগ করার মতো কিছু নেই। তবু সংসারের সাধারণ মনোভাব টের পাওয়া যায়। রঘুনাথ জানেন সেটা পিতা বা কন্যা কারো পক্ষেই অনুকূল নয়। নন্দার মতো বুদ্ধিমতী ও স্পর্শকাতর মেয়ে নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করছে। ক্রমশঃ আরো করবে। তিনি যেদিন থাকবেন না এখানে যারা তার আপন জন সবাই সেদিন মুখর হয়ে উঠবে। অন্য মূর্তি ধরবে। তার মা চেষ্টা করলেও তাকে সেই অভিশপ্ত রাত্রির লজ্জা গ্লানি ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে পারবেন না। মা-ও তো অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে আসেন নি। তাঁকেও একদিন যেতে হবে। তারপর?···

রঘুনাথের মনে এসব চিন্তা কিছুদিন থেকেই আনাগোনা করছিল। ঐদিন বুঝলেন এবার একটা কিছু করতে হবে। তখনই ঠিক করে উঠতে পারেন নি। মেয়েকে বললেন, আচ্ছা তুই যা।

সব সময়ের জন্যে বাড়ি এসে বসল নন্দা। নিজেকে বন্ধ করল তার সেই একখানা ঘরের মধ্যে। দিন রাত সেখানেই শোয়া বসা, এক আধটু পড়াশুনো! পড়তেও আর ভালো লাগত না।

স্নানের বেলা হলে ঝি এসে দরজায় টোকা দিত। নন্দা জানতে চাইত না, কেবা কী চাই। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসত জামা কাপড় তোয়ালে নিয়ে। স্নানের ঘর থেকেই ঢুকত গিয়ে খাবার ঘরে। ঠাকুর ভাত দিয়ে যেত। কোনোদিন হেমাঙ্গিনী এসে কাছে বসতেন, জিজ্ঞাসা করতেন আর একটু ভাত নিবি? আর এক-খানা মাছ দিক?

কখনো কখনো এক আধটু অনুযোগ—ওকি? এঁচড়ের ডালনাটা সরিয়ে রাখলি কেন? এ কী খাবার ছিরি? এমন করলে বাঁচবি কদিন?

নন্দা প্রায়ই কোনো উত্তর দিত না। কোনো কোনো দিন হয় তো বলত, আর পারছি না; পেট ভরে গেছে।

বলেই উঠে পড়ত। রাত্রেও ঐ একই রুটিনের পুনরাবৃত্তি।

হেমাঙ্গিনী রোজ আসতে পারতেন না। চলা ফেরায় কষ্ট হত। ইদানীং শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। সেদিন আসত বড় বৌ। মার চেয়ে একটু বেশী পীড়াপীড়ি করত এটা সেটা খাবার জন্যে। 'দুধ খাবো না' বললে বাটিটা নিজে হাতে তুলে ধরত মুখের কাছে। মিষ্টিটা জোর করে খাওয়াত। দু'একটা ধমক-টমক দিত।

দু'একদিন অন্য কথাও পাড়ত বড়বৌ,—তোর কী হয়েছে বল তো? সারাদিন ঘরে দোর দিয়ে করিস কী? এক আধবার বেরিয়ে এদিকে একটু আসতে পারিস না? মার তো ঐ শরীর।

আমি একা কদিক সামলাবো ?

নন্দা যথারীতি নিরুত্তর। সে বলতে পারত, তোমাদেরই বা কী হয়েছে বল ? একবার আসনা ডাকনা, একটা কথাবলনা আমার সঙ্গে।

বলতে পারত, কিন্তু বলত না।

সে তো জানে, তার আর বাড়ির অন্য সকলের মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল উঠে গেছে। সেও যেমন আগের মতো সহজভাবে মিশতে পারে না তাদের সঙ্গে, তারাও তেমনি পারে না। দুপক্ষই সেটা অনুভব করে। কিন্তু কোথায় কিসের একটা বাধা যেন কাটিয়ে ওঠা যায় না।

শুধু একজন কোনো বাধা মানত না। বড় বৌ-এর চার বছরের ছেলে শিবু। শিবপ্রসাদ। রঘুনাথের বাবা কাকারা ছিলেন 'প্রসাদ' —বাণীপ্রসাদ, সূর্যপ্রসাদ……। দুপুরুষ গেল 'নাথ'। তারপর আবার 'প্রসাদে' প্রত্যাবর্তন।

শিবু এসে মাঝে মাঝে জোরে জোরে ধাক্কা দিত কপাটের গায় —পিতি, দজ্জা খোলো।

নন্দা সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিত। ভাইপোকে টেনে নিত ঘরের মধ্যে। আদর করত, গল্প বলত, ছবি এঁকে, এটা ওটা দিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখত। বাচ্চা ছেলে, আর কতক্ষণ থাকবে এক জায়গায় ? কিছুক্ষণ পরেই বেড়িয়ে আসত।

তবু নন্দার সেই বাঁধা-ধরা একঘেয়েমির মধ্যে ঐটুকুই ছিল মধুর বৈচিত্র্য। একটানা অন্ধকারের বুকে এক ঝলক আলো। আর কারো সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্তা হত না বললেই হয়।

রমানাথরা সেই যে গেছে, আর আসে নি। এমনিতে নিশ্চয়ই

ঘুরে যেত দু-একবার, আগে যেমন করত, কিন্তু নন্দা বুঝেছিল, এবারে এতদিন না আসার মূলে রয়েছে সে।

মাঝে মাঝে মনে হত, এর চেয়ে তার স্কুলই ছিল ভালো। সেখানে যে ব্যবহারই পাক, তবু দুটো কথা বলার সুযোগ ছিল। ঐ সূত্রে একটুখানি বাইরে বেরোনো। আর, এযে একেবারে নির্জন কারাবাস।

বাবার সঙ্গে সেই যে কথা হয়েছিল স্কুল ছেড়ে দেবার ব্যাপার নিয়ে, তার পরে তিনি দু-একবার ওর খোঁজ নিয়েছেন। কোর্টে যাবার পথে কিংবা কোর্ট থেকে ফিরে দু-চারটা কথা। কখনো কখনো দু-একখানা বই দিয়ে বলেছেন, "পড়ে দেখিস, খুব ভালো বই।"

বেশির ভাগ ইংরেজি। ডিকেন্স-এর ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার টুইস্ট, টুর্গেনিভের ছোট গল্প, নুট হ্যাম্পসনের প্যান বা ঐ জাতীয় ক্লাসিক্স্, এক সময়ে তিনি যা পড়েছেন, পড়ে আনন্দ পেয়েছেন।

ক্লাস নাইনের ছাত্রী হলেও নন্দা অন্য সকলের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বইগুলো মোটামুটি বুঝতে পারত, যেখানে পারত না ডিকশনারী দেখে নিত। রঘুনাথ অবশ্য বলতেন, যেখানে বুঝতে কষ্ট হবে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিস।

নন্দা মনে মনে হাসত—জিজ্ঞেসটা করবো কখন? সেটুকু সময় আপনার হলে তো?

মুখে বলত, আচ্ছা। তারপরেই ডুবে যেত বইগুলোর মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জলযোগ সেরে কাছারি ঘরে যাবার পথে

নন্দার ঘরে এলেন রঘুনাথ। ওর চেয়ারটায় বসে ওকেও বসতে বললেন।

নন্দা বিছানার উপর বসল। আগ্রহ এবং তার উপর কিছুটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে রইল। কি জানি, কী বলবেন বাবা! যখনই আসেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো একটা কথা বলে ব্যস্তভাবে চলে যান। আজ নিশ্চযই বিশেষ কোনো একটা কারণ আছে।

রঘুনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কোলকাতা যাবি?

নন্দার বুকের ভিতরটা নেচে উঠল। কিন্তু বুঝতে পারল না, কোথায় যাবে কোলকাতায়। সেখানে তো তাদের বিশেষ কেউ আছে বলে শোনে নি। জানতে চাইল, বেড়াতে?

—বেড়াতে নয়, পড়তে। ওখানে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেবো। বোর্ডিংএ থাকবি। পারবি না?

নন্দা যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কোলকাতায় গিয়ে পড়বে! এতবড় সৌভাগ্য তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অপার আনন্দে, বাবার উপর গভীর কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারল না। রঘুনাথ বললেন, বাড়ির জন্য মন কেমন করবে?

এবার ঘন ঘন মাথা নাড়ল নন্দা। মন কেমন করবে কী! বাবাকে কেমন করে বোঝাবে মনে প্রাণে এইটাই সে চাইছিল। বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া। এ যে তার মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, তার সামনে একটা নতুন জীবনের দ্বার খুলে দিয়েছেন বাবা,

যে জীবন সেই এতটুকু থেকে তাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যাকে নিয়ে সে কতদিন কত অসম্ভব স্বপ্ন গড়েছে আর ভেঙেছে। বড় হবার, মানুষ হবার স্বপ্ন।

রঘুনাথ আশ্বাস দিলেন, মাঝে মাঝে আমি গিয়ে দেখে আসবো। তুইও আসতে পারবি ছুটি-ছাটায়।

নন্দা এতক্ষণে তার সেই অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল। হাসিমুখে বলল, কবে যাবো ?

—দাঁড়া, আগে সব ঠিকঠাক করি। দীনেশকে চিঠি দিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে জানিয়েছে, ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে সীট পাওয়া যাবে। ওখানে সুবিধে হল, স্কুলের সাথেই হস্টেল। সেখানেও জায়গা আছে, লিখেছে।

"দীনেশ কে ?" জানতে চাইল নন্দা।

—তুই চিনবি না। এখানে আমার জুনিয়র ছিল এক সময়ে। বছর দুই হল হাইকার্টে বেরোচ্ছে। একেবারে ছোট ভাইএর মতো। সেও গিয়ে মাঝে মাঝে তোকে দেখে আসতে পারবে।

রঘুনাথ মনে করেছিলেন হেমাঙ্গিনী হয়তো আপত্তি করবেন। মুখ ফুটে না বললেও মনে মনে সায় দিতে পারবেন না। নন্দা তার শেষ সন্তান। একদিন বড় হবে, বিয়ে হবে, শ্বশুরঘর করতে যাবে, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেমন সকল মা-ই থাকেন। কিন্তু এতো তেমন যাওয়া নয়।

বিয়ে থা না করে বাইরে পড়তে যায় কোনো কোনো মেয়ে, কেউ কেউ চাকরি নিয়েও যাচ্ছে আজকাল। তাদের পরিবারে অতখানি আধুনিকতা না ঢুকলেও, তেমন যদি হত, তিনি হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। কিন্তু এ তার কোনোটাই

নয়।

তবু হেমাঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে মত দিয়ে দিলেন। রঘুনাথ প্রথমে কিছুটা আশ্চর্য হলেও পরে বুঝলেন, এই সম্মতির মধ্যে মাতৃ হৃদয়ের কতখানি বেদনা জড়িয়ে আছে।

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনিও কি ভাবছিলেন না? কোনো কূল খুঁজে পান নি। এবার বুঝলেন ঠিকই করছেন স্বামী।

এছাড়া আর অন্য উপায় কী? মেয়েমানুষের যে চিরাচরিত পথ, তাঁরা সকলেই যা চেয়েছিলেন, সেটা যখন হল না, তখন ওর পথ ও নিজে করে নিক।

অবস্থার বিপাকে মানুষ সব কিছু সয়ে নেয়, মেনে নেয়। হেমাঙ্গিনীও তার নন্দার এই অভাবিত বিবর্তনকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করলেন।

৬

নতুন উদ্যমে নতুন জীবন শুরু করল নন্দা। এই তো তার চির-দিনের অভীষ্ট পথ। এই পথ ধরেই সে সাফল্যের শীর্ষে গিয়ে উঠবে। তার স্পষ্ট রূপটা সে জানে না। এখনো তো স্কুলেরগণ্ডি পার হতে পারে নি। অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। অনেকটা উপরে উঠতে হবে। তারপর সে ভাবনা।

এর মধ্যে স্থির করে নেবে, কোনোটা তার অভিপ্রেত, কোনো-দিকে তার যোগ্যতা। বিজ্ঞান-চর্চা, ঐতিহাসিক গবেষণা, না অন্য কিছু। বাবা তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, সে যতদূর যেতে চায় তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

তা'হলেও চিরকাল তো সে বাবার উপর নির্ভর করে থাকবে না।

একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে। সচ্ছল, স্বাবলম্বী একক জীবন। আর মাত্র ক'টা বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আর একটা কথাও সে মনে মনে উপলব্ধি করেছিল। শুধু তার নিজের ইচ্ছা বা নির্বাচন নয়, তার নিয়তিও তাকে এইখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

তারবাবামা আত্মীয় পরিজন যখন তাঁদের নিজস্ব রীতি ও পন্থায় তার ভবিষ্যৎ রচনায় তৎপর, তখন কোন্ এক অলক্ষ্য অঙ্গুলির ইঙ্গিতে একটি বিচিত্র ধারা তার জন্যে রচিত হচ্ছিল, যা চিরাচরিত জীবনধারা থেকে একেবারে আলাদা।

বিবাহ বলে যে একটি বস্তু আছে, হয়তো সব মেয়েই যা কামনা করে, তার বেলায় একটা অসমাপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সেটা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তা যাক। সেজন্যে তার অনুমাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু সে দুর্ঘটনা (তা ছাড়া আর কী বলা যায় তাকে ?) এমন একটা রূপ নিয়ে এল, যাকে সে শত চেষ্টাতেও জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সে এক আজব জীব। এদেশে বোধহয় তার কোনো সংজ্ঞা নেই। তার বিয়ে হয় নি, অর্থাৎ কোনো পুরুষ তার সীমন্তে সিন্দূর পরিয়ে দেয় নি। কিন্তু সে কুমারীও নয়।

তার পিতা শাস্ত্রমতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নি সাক্ষী রেখে পবিত্র শালগ্রাম শিলার সামনে তাকে একজনের হাতে সমর্পণ করেছেন, তারই সঙ্গে বাসর শয্যায় সে রাত্রিবাস করেছে। সেই শয্যাতেই বিবাহিতা নারীর যে চরমতম অভিজ্ঞতা তাও তার ঘটে গেছে। তার সম্মতি ছিল কি ছিল না, সে প্রশ্ন অবান্তর। তবু এই স্কুলে

এবং সর্বত্র কুমারী নন্দা ব্যানার্জি বলে তার পবিচয়।

এমন দৃষ্টান্ত কি আর একটিও পাওয়া যাবে? অন্ততঃ এদেশে তো নয়ই।

এদিক দিয়ে সে একক, অনন্য। তার কোনো দোসব মিলবে না।

যাই হোক, এসব চিন্তার আর অবকাশ নেই। তার সামনে এখন একটি মাত্র নিশানা। সেই দিকে চেয়েই তাকে অবিবাম দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।

সমস্ত মন, সমস্ত শক্তি দিয়ে তারই উদ্দেশে নিজেকে সঁপে দিল নন্দা ব্যানার্জি।

যথাসময়ে স্কুলের পাঠ শেষ হল। ফার্স্ট ডিভিসনের উপবের দিকেই ছিল নামটা। রঘুনাথ এসে মেয়েকে বেথুনে ভর্তি করে দিলেন। কলেজ হস্টেলে সীট পাওয়া গেল না। উত্তব কোল-কাতায় একটা মেয়েদের বোর্ডিং-এ জায়গা হল। ট্রামে করে আসতে যেতে হয়। কোনো অসুবিধা নেই।

একদিন কলেজের ওপারেব স্টপে নামতেই চোখে পড়ল, কয়েক হাত দূরে একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাব দিকে। চোখাচোখি হতেই চমকে উঠল নন্দা। একটি রাতের দেখা, তবু চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে কলেজের গেটে যখন ঢুকছে, তখনো দেখল, সে তাকিয়ে আছে। বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ভবে উঠল সারা মন।

তিন-চার দিন পরে আবার দেখা। ঐ একই জায়গায়। ট্রাম

থেকেই লক্ষ্য করল নন্দা। এবার আর চোখ তুলে তাকাল না। যেন দেখতে পায় নি এমন ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল।

কিন্তু তার পরেও সে থামল না। মাঝে মাঝে আসে, ঐ একই সময়ে একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়। কী করবে নন্দা? কতবার আর এমনি না দেখার ভান করে চলে যাবে?

তাছাড়া কখনো কখনো আরো মেয়ে আসে ঐ ট্রামে। তাদের চোখেও পড়তে পারে, মনে হতে পারে লোকটাকে যেন আগেও দেখা গেছে ঐখানটায়। নন্দার দিকেই যে তার দৃষ্টি, মেয়েদের চোখে সেটা এড়াবে না। ঐ নিয়ে হয়তো ঘোঁট পাকাবে তারা। এর জন্যে তাকেই হয়তো জবাবদিহি করতে হবে।

যেমন করে হোক ওর এই হ্যাংলার মতো আসা আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা বন্ধ করতে হবে, স্থির করল নন্দা। কিন্তু কী করে? সোজা গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে? বলবে, কেন আসেন আপনি? কী চান? লজ্জা করে না এমন করে মেয়েদের কলেজের সামনে এসে দাঁড়াতে?

এই ধরনের একটা পথ নেবে যখন ভাবছিল তার আগেই এল একটা চিঠি। তার বোর্ডিং-এর ঠিকানায়। কয়েকটা মাত্র লাইন —'মুহূর্তের দুর্বলতায় যে ভুল করেছি, তার কি কোনো ক্ষমা নেই? যাই ঘটুক না কেন, তুমি আমার স্ত্রী। বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় নি বলে কিছু আসে যায় না। আমার কাছে এটা অখণ্ডনীয় সত্য। তুমিও অস্বীকার করতে পার না।

তোমারই জন্যে আমি কলকাতায় এসেছি, বাসা নিয়েছি, এখানেই প্রাকটিস শুরু করবো। তোমার পড়াশুনোয় কোনো

ব্যাঘাত হবে না। তোমার কোনো ইচ্ছাকে আমি কোনো দিন বাধা দেবো না। তুমি এসো। এমন করে দুটো জীবন নষ্ট করো না। তোমার চিঠি পেলেই আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।'

নন্দা চিঠিটা পড়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

তারপর যখন ভাবতে বসল, একটা ভয় এসে জুড়ে বসল তার মনে। ও যদি আরো এগিয়ে আসে, আরো চিঠি লেখে কিংবা এই বোর্ডিং-এ এসেই যদি উপস্থিত হয়? চিঠির সুর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও সহজে নিরস্ত হবে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে বলছে—তুমি আমার স্ত্রী! সেই দাবি নিয়ে যেন লড়বার জন্যে প্রস্তুত।

ভিতরে ভিতরে বড় অসহায় বোধ করল নন্দা। কী করবে সে? বাবাকে লিখবে? কোন্ মুখে? এমনিতেই তাকে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার অবধি নেই। তার উপরে আরো একটা জুড়ে দেবে?

ক'দিন পরেই এল দ্বিতীয় চিঠি। চিঠির বাক্স থেকে পাশের ঘরের একটি মেয়ে এনে পৌঁছে দিল। নন্দা খামটা এক নজর দেখে, না খুলেই সরিয়ে রেখে দিচ্ছে লক্ষ্য করে বলল, ও কি, পড়লি না?

—পরে পড়বো। এখন সময় নেই।

—না, আমার সামনে খুলবি না?—মুখ টিপে হাসল মেয়েটি—আচ্ছা বাবা, আমি চলে যাচ্ছি।

বলে, সত্যিই চলে গেল। যাবার আগে এমন আরেকটি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গেল, যার অর্থ অতি পরিষ্কার।

এ চিঠিটা আরো সংক্ষিপ্ত। একটিবার দেখা করার একান্ত অনুরোধ জানিয়েছে। তার কথাটা সে আরো বিশদাকারে বোঝাতে চায়,

চিঠিতে যা সম্ভব নয়। বোর্ডিং-এ গিয়ে নন্দার কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে চায় না। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে যেতে লিখেছে। দিন-ক্ষণ ও সঠিক জায়গার নির্দেশ দেওয়া আছে চিঠির শেষদিকটায়।

নন্দা স্থির করে ফেলল এর পরে আর চুপ করে বসে থাকা চ'লে না। পাশের ঘরের মেয়েটার ঐ বিশেষ হাসিটি চোখের উপর ভাসছিল। সন্দেহ করছে এবং করাই স্বাভাবিক যে এই চিঠির ভিতর দিয়ে কারো সঙ্গে তার গোপন প্রেম চলছে। সন্দেহটা শুধু ঐ এক জায়গায় থাকবে না, সারা বোর্ডিং-এ ছড়িয়ে পড়বে। কর্তৃপক্ষের কানে উঠবে। তারপর ?

একটা কাগজ টেনে নিয়ে তখনই লিখে ফেলল নন্দা—'আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি বললেও আমি স্বীকার করি না, কখনো করবো না। সুতরাং দেখা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। চিঠি লিখে বা দেখা করার চেষ্টা করে আমাকে বিব্রত করবেন না। তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে, নয়তো বিষ খেতে হবে।'

এর পর আর চিঠি আসে নি, কলেজের সামনে বা অন্য কোথাও সেই পরিচিত চেহারাটা আর দেখা যায় নি।

নন্দা ব্যানার্জির কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বাকী দিনগুলো নিতান্ত মামুলী ও ঘটনাহীন। কিন্তু এই ক'বছরে ইসলামপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে বেশ কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

ঠাকুরমা তো গেছেন তার 'বিয়ের' ক'দিন পরেই। তার কয়েক বছর পরে গেছেন মা। তাঁর গুরুতর অসুখের জরুরী খবর পেয়ে নন্দা ক'দিনের জন্যে বাড়ি গিয়েছিল। ফিরেছিল মায়ের শেষ কাজ সেরে। তখনই দেখেছিল, বাবার শরীর ভেঙে পড়েছে। নিয়মিত কোর্টে যান না। দাদাকে আর একটু দাঁড় করিয়ে দিয়েই ওখান থেকে ছুটি নেবেন, এই রকম ইচ্ছা এবং সেই জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

পরে খবর পেয়েছে, তাঁর ছুটি হয়ে গেছে এবং এবার বোধহয় শেষ ছুটির দিকে চেয়ে দিন গুনছেন।

বাড়ি থাকতে আরেকটা খবর কানে এসেছিল, বীরেশ্বর মুখুজ্যে তাঁর বড়ছেলের আবার বিয়ে দেবার আয়োজন করছেন।

বাবার রোজগার যখন চলে গেল, নন্দা তখন থেকেই ঠিক করেছিল এবার আর ইসলামপুরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। দাদারা এবং বিশেষ করে বৌদিরা তার 'বিয়ের' রাতের 'বাড়াবাড়িটা' কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেননি। বাবাকে লিখেছিল, সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

রঘুনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "এম. এ.-টা পাস কর। তার আগে কোনো কিছু করবার চেষ্টা করো না। প্র্যাক্টিস্ ছেড়ে দিলেও তোমার এই সামান্য প্রয়োজন আমি মেটাতে পারবো।"

সেই ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিল নন্দা। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী?

এম.এ.-তে অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস ফসকে গেল। সুতরাং কলেজের চাকরির কথাই ওঠে না। সেজন্যে অপেক্ষা করাও চলে না। বাবাকে সে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি দিতে চাইছিল। চেষ্টা

করছিল যেখানে হোক একটা স্কুলের চাকরি জুটিয়ে নেবার। কিছুদিনের মধ্যে শুধু একটা দরখাস্তের জোরেই বিহারের এই ছোট শহরে স্কুলের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল। প্রথমে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টীচার হিসাবেই এসেছিল। পরে স্কুল থেকে ডেপুটেশনে পাটনায় গিয়ে বি. টি. পাস করে আসে এবং নিজের যোগ্যতা বলে ধাপে ধাপে হেডমিস্ট্রেসের পদে গিয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে সেও কত বছর হয়ে গেল!

৭

এব পর একটি নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা কবলেন স্মরজিৎ বাবু এবং তাব আগে একটি ছোট্ট ভূমিকা, যাব সাবমর্ম হল (মানুষেব জীবনকে সাধাবণত নদীব সঙ্গে তুলনা কবা হয়। এ দুয়ের ভিতরকার মিল হচ্ছে তাদেব গতি, তরঙ্গ, ভাঙাগড়া এবং উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন ধাবা।)

নন্দা ব্যানার্জি তার জীবনের উৎস থেকে সেই কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তার রুটিন-বাঁধা স্কুলের দিনগুলো ও বলতে গেলে গতিহীন, নিস্তরঙ্গ। তার উপরে তার স্বভাবের মধ্যে এমন একটি প্রশান্তি আছে, যে তার এখনকার জীবনটাকে নদী না বলে বলা যায় একটি নিভৃত নির্জন গ্রাম্য পুকুব।

সেই পুকুরে একদিন একটা ঢিল এসে পড়ল।

স্কুলের ভর্তির খাতাটা এসেছিল তার টেবিলে। হেড মিষ্ট্রেসের সই দরকার। তুলে নিয়ে একটি নতুন ভর্তি হওয়া মেয়ের বাপের নামটা দেখে চমকে উঠল নন্দা। তারপর মনে মনে হাসল—এ রকম মিল তো কত দেখা যায়!

তবু কি ভেবে টিফিনের সময় ডেকে পাঠাল মেয়েটিকে। বেশ দেখতে। একটি শান্ত শ্রী আছে চোখে মুখে। স্বভাবটা নম্র। নামটিও মিষ্টি, সুমিতা, সুমিতা মুখার্জি। মামা রেলের চাকরে। সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন এখানে। তার কাছে থেকেই পড়ে ও। ওকেও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়েছে।

—তোমার বাবা কোথায় থাকেন? জানতে চাইল নন্দা।

—কোলকাতায়।

—কী করেন?

—ওকালতি।

আরেকটা চমক লাগল নন্দার। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের দেশ কোথায়?

—পূর্ববাংলায় ছিল শুনেছি। আমি কখনো যাই নি; দেশ-ভাগের পর বাবাও যান নি।

—কোথায়, জানো?

—বিক্রমপুর বলে একটা জায়গা আছে না? সেইখানে।

এবার নন্দার বুকের ভিতরটা সত্যি সত্যি কেঁপে উঠল। মুন্সীগঞ্জ তো বিক্রমপুরের মধ্যে। একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, বিক্রম-পুরের কোন্ জায়গায়, বলতে পার? শহর বা গ্রামের নাম কী? কেমন যেন সাহস হল না। যদি সব কিছু মিলে যায়? না, না;

ঐ অনিশ্চয়ের আড়ালটুকু বরং থাক। সেই সঙ্গে একটুখানি সংশয়ের ছায়া।···

কিন্তু যা ভাবছে সত্যিই যদি তাই হয়?···তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মেয়েটির মুখের পানে। একটু যেন আদল আসে। কিংবা হয়তো ওটা ওর কল্পনা। তাছাড়া এতদিনে সে চেহারাটাও ঠিক মনে পড়ছে না। প্রশ্ন করল, তোমার মা-ও বুঝি কোলকাতায়?

—আমার মা নেই। আমি যখন চার বছরের তখন তাঁকে হারিয়েছি। সেই থেকে মামারবাড়িতে মানুষ।

—আচ্ছা, তুমি যাও।

সুমিতা হেডমিস্ট্রেসকে নমস্কার করে চলে গেল। তাঁর ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেও আরেকটা কোন্ অলক্ষ্য দ্বারপথে তাঁর গোপন মনের নিভৃতে গিয়ে বসল।

সেই থেকে শুরু হল দ্বন্দ্ব—'তার মেয়ে, কী হয়েছে তাতে? আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? অন্য সব মেয়ের মতো এও আমার একজন ছাত্রী। তার বেশী কিছু নয়।'

'কিছু নয়, তবু তার ঐ পরিচয় পাবার পর থেকে তুমি তাকে সবার চেয়ে আলাদা করে দেখছ কেন? তাকে দেখতে, তাকে কাছে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠছ, তাও কি তুমি অস্বীকার করতে চাও?

নন্দার দিন কাটতে লাগল এমনি একটা অস্থিরতার ভিতর দিয়ে। মাঝে মাঝে মেয়েটার উপর অকারণে রুষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর আবার নিজেই কষ্ট পায়। আহা, বেচারা! ও তো কিছু জানে না! কাছে ডেকে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করে। যখন ঘরে কেউ নেই গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে।

কখনো ইচ্ছা করে একটা কোনো ছুটির দিনে ওকে বাড়িতে ডেকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে। যা ও খেতে ভালবাসে। তারপর ভাবে সেটা কি ভালো দেখাবে? কে ও? তার অন্য দশটি ছাত্রী যেমন ঐ সুমিতাও তেমনি।

বিধাতার এমন চক্রান্ত, কিছুদিন পরে সে সুযোগ আপনা হতেই এসে গেল। শুধু একটা দিন নয়, বেশ কিছুদিনের জন্যে সুমিতা এসে উঠল ওর বাড়িতে।

তার মামার আবার বদলির হুকুম এসে গেছে। শুধু বদলি হলে হয়তো কাটিয়ে দেওয়া যেত। বলা যেত, এই তো সবে মাস কয়েক হল এসেছি এখানে! কিন্তু এটা হল বদলির সঙ্গে প্রমোশন। সুতরাং না-যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ভাগনীকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল ভদ্রলোক। বছরের শেষ; সামনে পরীক্ষা। এখন গিয়ে কি আর নতুন স্কুলে জায়গা পাবে? তার মানে একটা বছর নষ্ট। এখানে কোনো হস্টেল বা বোর্ডিংও নেই মেয়েদের থাকবার মতো। কাজেই ওকেও যেতে হবে।

এই খবর দিতে এবং ট্রান্সফার সার্টিফিকেট কবে পাওয়া যাবে জানবার জন্যে সুমিতা এসে ম্লানমুখে দাঁড়াল হেডমিস্ট্রেসের ঘরে। নন্দা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তুমি আমার কাছে থাকবে।' যেন এটাই একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা। তার পরেই চমকে উঠল নিজের মনে। এ কী করল সে? ঐ মেয়েটির সঙ্গে কী সম্পর্ক যে তার বাড়িতে এসে থাকতে বলে দিল? এমন তো আরও কত মেয়ে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে। এ রকম অসুবিধাও ঘটেছে কারো কারো বেলায়। তাদের তো কই আশ্রয় দেয় নি। মনেই আসে নি সে কথা। আর, এ এসে বলা

মাত্র সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'তুমি আমার কাছে এসে থাকবে'। ওরাই বা কী ভাববে ?

কিন্তু বলে যখন ফেলেছে আর সেটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সুমিতার মামা তাকে পৌঁছে দিতে এল। ঐ সঙ্গে খরচপত্রের কথাটা তুলবে ভেবেছিল। কিন্তু হেডমিস্ট্রেসের কথাবার্তায়,আচরণে তার ভাগনীর প্রতি এমন একটা মনোভাব লক্ষ্য করল,যার পরে আর তুলতে পারল না। হয়তো সাহস করল না। মনে মনে ভাবল, এখন তো থাক, পরে দেখা যাবে।

হেডমিস্ট্রেসকে 'বড়দি' বলে ডাকে মেয়েরা। সুমিতাও তাই বলত। কড়া ধমক খেল একদিন "এটা কি স্কুল নাকি যে 'বড়দি' 'বড়দি' করছ? তোমার মার চেয়ে আমি নিশ্চয়ই বড় হবো বয়সে। মাসিমা বলে ডাকবে।"

মেয়েটিও হয়তো মনে মনে তাই চাইছিল। মায়ের স্নেহ তো জানে না। তার স্বাদ এই প্রথম পেল জীবনে।

সুমিতা বোধহয় মাস তিনেক ছিল নন্দার কাছে।

স্মরজিৎ বাবু বলছিলেন, অসীমা তো প্রায়ই যেত। গিয়ে দেখত ঐ মেয়েটাকে নিয়েই আছে। হয় তাকে পড়াচ্ছে, কিংবা পড়তে বসিয়ে দিয়ে খাবার করছে তার জন্যে। কখনো বা পাশে বসিয়ে গল্প করছে।

স্কুলে না গেলে নয়। ফিরে এসেই সুমি। সুমির জন্যে নতুন জামা কাপড়, নতুন জুতো। পরীক্ষা আসছে, খাটতে হচ্ছে, তার জন্যে আলাদা দুধের ব্যবস্থা। নন্দা ডিম খেত না। সুমির জন্যে সকালে চায়ের সঙ্গে ডিমের পোচ্।

মেয়েটা প্রথম প্রথম কয়েকদিন একটু সঙ্কোচ বোধ করত। অত

অত খেতে চাইত না। বিকাল বেলা সাজ গোজ করতে লজ্জা পেত। তারপর সেও ভুলে গেল নন্দা তার হেডমিস্ট্রেস। 'মাসিমা' বলত বটে, কিন্তু মনে মনে জানত মার কাছে আছে। মা ছাড়া আর কে করে এতখানি?
অসীমা মাঝে মাঝে বলত মেয়েটা আর জন্মে নিশ্চয়ই ওর পেটের মেয়ে ছিল।

পরীক্ষা শেষ হবার কয়েকদিন পর সুমিতা একটা চিঠি নিয়ে খুশী মুখে ঢুকল নন্দার ঘরে—"বাবা আসছেন পরশু। এই মাত্র ওঁর চিঠি পেলাম।"
নন্দা কী একটা করছিল। হঠাৎ চমকে উঠে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যে তার সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মেয়েটা। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, আপনার কথা লিখেছিলাম কিনা, তাই একবার দেখা করতে আসছেন।
দেখা করতে! নন্দার চোখে মুখে ত্রাসের ছায়া পড়ল। তাকে ঢাকতে গিয়েই বোধহয় অনেকখানি রূঢ়তা বেরিয়ে এল গলার স্বরে—"আমার কথা কে লিখতে বলল তোমাকে? কী লিখেছ?"
সুমিতা ভয়ে ভয়ে বলল, আমি এখানে খুব ভালো আছি। মাসিমা আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন, এইটুকুন খালি লিখেছি।
ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে নন্দা।
হাসিমুখ করে বলল, ওসব বুঝি লিখতে হয় বাবাকে? বোকা মেয়ে।
সুমিতা ঘর থেকে চলে যেতেই ভাবতে বসল, এবার কী করবে?

কোথাও চলে যাবে একদিনের জন্যে? কিন্তু মেয়েটা কী ভাববে? ও এত করে লিখেছে, আর সে-ও কিছু না জেনে আসছে হেড-মিস্ট্রেসের কাছে মেয়ের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে। এর পরে পালিয়ে যাবে কোন্ অজুহাতে? না, এখন আর যাওয়া চলে না। আর, পালাবেই বা কিসের ভয়ে? আসুক না।

এতক্ষণ একনাগাড়ে বক বক করে আবার একটু গলা ভিজিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করছিলেন স্মরজিৎবাবু। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর বংশীলালও ট্রে হাতে ঢুকল। হেসে বললেন, এরই নাম টেলিপ্যাথি।

মৃগাঙ্ক তার কাপটা তুলে নিতে নিতে বলল, আপনার এই বাহনটিকে দেখে সত্যিই লোভ হচ্ছে। ওকে আমি একদিন কিডন্যাপ করবো।

—লাভ নেই, রাখতে পারবে না। ষোল বছর আছে আমার কাছে।

—যাক্, সেটা পরে দেখা যাবে। এবার আসল ব্যাপারে আসুন।

"তারপর ভদ্রলোক এলেন এবং দেখা গেল"—চায়ে চুমুক দিয়ে যোগ করলেন স্মরজিৎ, "তিনি অন্য লোক"।

অন্য লোক! মৃগাঙ্ক সোফার পিঠে হেলান দিয়ে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ যেন একটা শক খেয়ে সোজা হয়ে বসল। খানিকটা চা উছলে পড়ল।

স্মরজিৎ হাসলেন, "গল্পের ছকে মিলল না। কী বল? না মিললে আমি আর কী করতে পারি? জীবনটা তো তোমাদের সাহিত্যের বাঁধা পথে চলে না। অবিশ্যি তোমার বৌদিও ঠিক অমনি করেই

চমকে উঠেছিল সেদিন। তারপরেই নন্দার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল, সেখানকার অবস্থাটা কী? কিন্তু অত সহজে কি বোঝা যায়?

নন্দার কথা যখন শেষ হল তারপরেও অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। অসীমাও কেমন নির্বিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তারপর নন্দার গলাই শোনা গেল প্রথম। একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব কিছু যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হালকা সুরে বলল, ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ টন্যবাদ জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্যি, অ্যাদ্দিন ধরে কী বোকামি করে-ছিলাম বলুন তো! এরকম মিল কি হয় না? এই তো আমার স্টাফেই দুজন সান্ত্বনা ঘোষ রয়েছে। অথচ আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল কটা মাস। সারাক্ষণ একটা মিথ্যা নেশার ঘোরে ঘুরে মরেছি।

অসীমা ফিরছে না দেখে ভাবনা হচ্ছিল। এত দেরি তো করে না কোনোদিন। শেষ পর্যন্ত বংশীকে পাঠালাম। তাকে দেখতে পেয়ে উঠল।

খানিকটা এসে তার মনে হল,—“নন্দাকেও ডেকে নিয়ে আসি। এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাবে দুটো। ওর মনের যা অবস্থা হয় তো না খেয়েই শুয়ে পড়বে।”

ফিরে গিয়ে ঢুকল ওর বাড়িতে। বসবার ঘরে পাওয়া গেল না। শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

অন্ধকার ঘর। পাশের জানলা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। দেখা গেল, বালিশে মুখ গুঁজে বিছানার উপর উপুড়

হয়ে পড়ে আছে নন্দা। কান্নার আবেগে সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল অসীমা। সে কান্নার যেন শেষ নেই। কিন্তু কেন, কার জন্যে এমন করে কাঁদছে নন্দা? এখনই না বলছিল, একটা কি নেশার ঘোরে ঘুরে মরছিলাম। যখন দেখলাম সবটাই ভুল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেটা কি ওর অন্তরের কথা, না, নিজেকে ভুল বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা?

দোর গোড়া থেকেই নিঃশব্দে ফিরে এল অসীমা। মনে মনে বলল, আজকের রাতটা ও একা থাক, নিজেকে নিয়ে থাক।